দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

জাতীয়তাবাদ বনাম মেরুকরণের রাজনীতি
— পৃ: ১২

একাত্ম মানবদর্শনের বিচারধারায় ভারতের সংবিধান
— পৃ: ৩১

৬৮ বর্ষ, ৩ সংখ্যা ।। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ।। ৩ আশ্বিন - ১৪২২ ।। website : www.eswastika.com

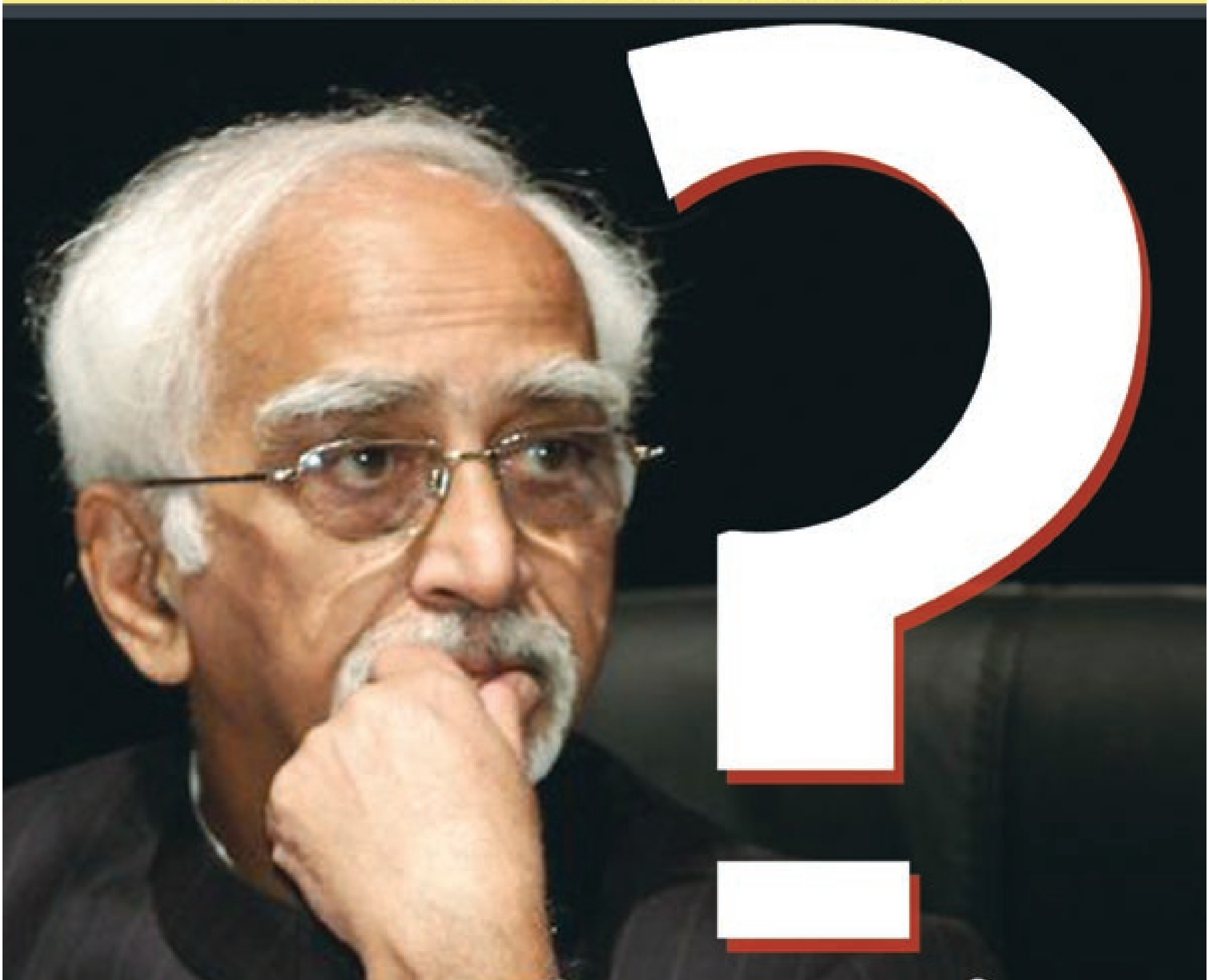

ভারতে মুসলমানরা বঞ্চিত হলে আপনি কীভাবে উপরাষ্ট্রপতি হলেন আনসারি সাহেব

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ৩ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২১ সেপ্টেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

ইসলামিক স্টেট পশ্চিম এশিয়াকে খতম করছে, ভারত মোটেই নিরাপদ নয় □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : সরকারি কর্মচারীরা মহাখুশি, পুজোয় দিদির উপহার 'ডিএ' টুপি □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

জাতীয়তাবাদ বনাম মেরুকরণের রাজনীতি □ দেবব্রত ঘোষ □ ১২

মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি সাহেবের কাছে খোলা চিঠি □ কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী □ ১৪

অকপটতার জন্য উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি সাহেব ধন্যবাদার্হ □ অমলেশ মিশ্র □ ১৬

বাগবাজার গোস্বামীবাড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গাপূজা □ সপ্তর্ষি ঘোষ □ ২১

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জন্মাষ্টমী উৎসব; শ্রীকৃষ্ণ এক আন্তর্জাতিক প্রবাদ পুরুষ □ শুভদীপ পাল □ ২২

শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী যুগের নতুন ধারার মন্দির : বাংলার মন্দিরে মন্দিরে - আজুড়িয়া □ ড. প্রণব রায় □ ২৩

ধর্মীয় গোঁড়ামির সমার্থক ঔরঙ্গজেবের নাম আধুনিক ভারতের পথ-ফলক হিসাবে শোভন নয় □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২৭

বাঘা যতীনের শহীদ-শতবর্ষে কূটনৈতিক সাফল্যের পরিকল্পনা কেন্দ্রের □ ২৯

একাত্ম মানবদর্শনের বিচারধারায় ভারতের সংবিধান □ অমল কান্তি বসু □ ৩১

দীনদয়ালজীর অবদান □ শ্রী ভালচন্দ্র কৃষ্ণাজী কেলকর □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬ □

অন্যরকম : ৩৩ □ সুস্বাস্থ্য: ৩৫

□ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮□ খেলা : ৩৯ □

শব্দরূপ : ৪০ □ চিত্রকথা : ৪১ □

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সামাজিক অবক্ষয়

সংবাদ মাধ্যমের উপর চোখ রাখলেই আমাদের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের যে সামাজিক অবক্ষয়— ধর্ষণ, খুন, পরিবারে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অবস্থাটা এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে জনৈক পত্রলেখকের খেদোক্তি— ‘আর পারছি না’। এই প্রসঙ্গেই এবারের বিষয়— সামাজিক অবক্ষয় আর কত দেখতে হবে?

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয় নয়

কাশ্মীর উপত্যকায় সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক হাফ-ম্যারাথন প্রতিযোগিতা নিরাপত্তারক্ষী ও স্থানীয় যুবকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ম্লান হইয়া গেল। শ্রীনগরের ডাল লেককে রক্ষা করিবার বার্তা দিয়া আয়োজিত হইয়াছিল এই আন্তর্জাতিক হাফ ম্যারাথন অর্থাৎ ২১ কিলোমিটারের দৌড়। পনেরো জন আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলিট এবং পনেরো হাজার দেশীয় ক্রীড়াবিদ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরতবালে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর হইতে শুরু করিয়া ডাল লেকের তীরে ফোরশোর রোড ধরিয়া এই দৌড় প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ম্যারাথন দৌড় শুরু হইবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড়ের মধ্য হইতে মহিলা প্রতিযোগীদের লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন কটূক্তি উড়িয়া আসিতে থাকে। শুরু হয় বাক্-বিতণ্ডা। নিরাপত্তা কর্মীরা রুখিয়া দাঁড়াইলে শুরু হয় পাথর ছোঁড়া। গণ্ডগোলের সময় একদল যুবক ভারত-বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে এবং পাকিস্তানের পতাকা দেখায় বলিয়াও অভিযোগ উঠিয়াছে। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে, লাঠি চার্জও করা হয়।

এই ঘটনা যেহেতু কাশ্মীর উপত্যকায় ঘটিয়াছে, সেই কারণে কেন্দ্র সরকারের যথেষ্ট মাথাব্যথা হইবার কারণ আছে। বিষয়টি নিছকই যৌন হেনস্থা নাকি ইহার পিছনে অন্য কোনো ষড়যন্ত্র কাজ করিতেছে তাহা খতিয়া দেখিতে চাহিতেছে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গোটা ঘটনায় উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হুরিয়তের যোগ রহিয়াছে কিনা, তাহাও কেন্দ্রের বিবেচ্য। কাশ্মীরের মানুষের জন্য এই কল্যাণমূলক প্রকল্প ভেস্তে দিবার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহযোগী পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের কোনো শক্তি পূর্ব-পরিকল্পনা করিয়াছিল কিনা কেন্দ্র সরকার তাহাও তদন্ত করিয়া দেখিবে বলিয়া জানাইয়াছে।

জনকল্যাণের জন্য আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের এইভাবে রাজনীতিকরণ লজ্জাজনক। উপত্যকায় দিশাহীন, হিংসাত্মক একদল লোক যে কোনো ছুতায় ভারত-বিরোধী কাজকর্ম করিয়া চলিতেছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় উপত্যকাবাসী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যে মানসিকতা ছিল, আজও তাহাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে তাহা সমভাবে বর্তমান।

অথচ কাশ্মীর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য যাহাকে অনেক সময়ই ভারতের প্রবেশ দ্বার বলা হয়। উল্লেখ্য, গজনির সুলতান মামুদ এই পথেই ১৭ বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। স্বাধীন ভারতের সূচনাপর্বে আমাদের দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর অদূরদর্শিতার কারণে কাশ্মীরের জন্য যে ৩৭০ ধারা জারি হইয়াছিল, তাহার ফলে কাশ্মীরের রহিল আলাদা জাতীয় পতাকা, তাহাদের নিজস্ব আইনি ক্ষমতা, আরও অনেক কিছু যাহা স্বেচ্ছায় করা যায়। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার বীজ তখনই বপন করা হইয়াছে। আর এই বিচ্ছিন্নতার বিষবৃক্ষে পাকিস্তান নানাভাবে নিরন্তর জলসেচন করিয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উপত্যকাকে হিন্দুশূন্য করিয়াছে। প্রায় ৩ লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিত আজ স্বদেশেই শরণার্থীর জীবনযাপন করিতেছেন। হজরতবাল মন্দির হইতে চুরির ঘটনা হউক বা অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য বানতালে অস্থায়ী আবাস তৈরি হউক—বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এইরকম যে কোনো ইস্যুতে ভারতবিরোধী স্লোগান দিয়া হিংসাত্মক আক্রমণ চালাইতেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবিলা করিতে গিয়া ভারতের বহু নিরাপত্তাকর্মী শহীদের মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। কাশ্মীরে হাফ-ম্যারাথনকে কেন্দ্র করিয়া যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহাকে তাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া দেখিলে অত্যন্ত ভুল হইবে। ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করিয়া দোষীদিগের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হইবে। আপাত দৃষ্টিতে ঘটনাটি সামান্য হইলেও কোনোভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না।

সুভাষিতম্

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান।
নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্বমায়তনং ত্যজেৎ।। (চাণক্যনীতি)

বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক পা এগুলেও অন্য পায়ে অবস্থান করেন । পরবর্তী স্থান ঠিকভাবে না দেখে আগের স্থান ত্যাগ করেন না।

কেন্দ্রীয় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রীর বক্তব্য ঘিরে অনভিপ্রেত বিতর্ক

স্বার্থে ঘা পড়তেই গৈরিকীকরণের জুজু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ড. মহেশ শর্মা। আর তাতেই 'গৈরিকীকরণ'-এর গন্ধ খুঁজে পেলেন ছিদ্রান্বেষীরা। ঠিক কী বলেছিলেন মহেশ শর্মা। সম্প্রতি এক ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : 'তিনটি প্রজন্ম একই রান্নাঘরে রান্না করছে এবং একই টেবিলে বসে আহার করছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক থাকবে এমনই সুদৃঢ় এবং তার ভিত্তি হবে গভীর শ্রদ্ধা। এটাই ভারতীয় সংস্কৃতি।' তিনি আরও বলেছিলেন : 'নভেল পড়ার আগে আমার মতে মূল্যবোধ সংক্রান্ত বই-পত্তর পড়া ভালো। আজকের যুবকেরা ছুটি কাটাতে সময় পেলেই থাইল্যান্ড, দুবাই, সিঙ্গাপুর ঘুরে আসে। কিন্তু তাদের অবশ্যই আমাদের মিউজিয়মগুলি আগে দর্শন করা উচিত। যাতে তারা নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে।' আর এ ব্যাপারে তিনি রামায়ণ, মহাভারত কিংবা গীতার মতো ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক গ্রন্থগুলির প্রসঙ্গ তুলে আনেন আর তাতেই গেল গেল রব তোলে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে রাজনীতি করা রাজনৈতিক দলগুলি। তারা দাবি তোলে গৈরিকীকরণ করা হচ্ছে।

যদিও এদের হাস্যকর দাবি তথ্যাভিজ্ঞ মহলের কাছে বিশেষ পাত্তা পাচ্ছে না। কারণ

মহেশ শর্মা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাব যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, তাতে মহেশ শর্মার কথাগুলি অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। তিনি এও বলেছেন : 'পাশ্চাত্য সংস্কৃতি খারাপ এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু সেটা আমাদের জন্য ভালো নয়। একটা ১৫ বছরের ছেলে তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকবে না কিংবা একটা ১৪ বছরের মেয়ে নিজের মতো করে জীবন-যাপন করবে এটা ভারতবর্ষে চলতে পারে না।' কিন্তু ঝোপ বুঝে কোপ মারতে অভ্যস্ত এদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারবারিরা স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্যে মূল্যবোধের আদর্শ দেখতে না পেয়ে গৈরিকীকরণের জুজু দেখতে পেয়েছেন।

তবে এনিয়ে শুধু নীতিকথা শুনিয়েই যে কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে বসে থাকবে না তা মহেশ শর্মার কথাতেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন সরকারি তহবিলে চলা ৩৯টি সংস্থা, যার মধ্যে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ম ও লাইব্রেরি এবং ন্যাশনাল স্কুল অব্ ড্রামার মতো সংস্থাও রয়েছে, এদের বিরুদ্ধে 'সাংস্কৃতিক দূষণ'-এর অভিযোগ তাঁর কানে এসেছে। সুতরাং এগুলি পুনর্গঠনে কেন্দ্রের নৈতিক দায়িত্ব আছে বলেও তিনি মনে করেন। এ ব্যাপারে সরকার 'সাংস্কৃতিক ব্যুরোক্র্যাসি' সৃষ্টি করে এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করবে বলে মন্তব্য করেন। একইসঙ্গে জানান, এ ধরনের স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে কিংবা আদর্শে হস্তক্ষেপ করার কোনো বাসনা সরকারের নেই। কিন্তু এগুলিকে উন্নত ও আধুনিক করার অধিকার তাঁর রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট মহলও মনে করছে সরকারি অনুদানে চলা কোনো প্রতিষ্ঠানই জাতীয় আদর্শের পরিপন্থী ভাবধারায় চলতে পারে না। এখানে স্বশাসিত সংস্থার কাজে সরকারের হস্তক্ষেপের বিষয়টি অবান্তর। আসলে নেহরু-গান্ধী পরিবারের আমলে জাতীয়তাবোধকে সর্বস্তরে ভুলিয়ে দেবার যে চক্রান্ত হয়েছে এগুলিও সেই ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। তাই শ্রী শর্মা সংস্কৃত ভাষাকে নতুন করে তুলে আনা এবং প্রকৃত ইতিহাস রচনার গুরুত্বের কথা জানান। নিন্দুকদের কাছে 'গৈরিকীকরণ' বিষয়টি কী তা তুলে ধরতে একটি মজার উদাহরণ টেনে এনেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী। একটি ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন— 'ধরা যাক আমরা ইংরাজি পড়তে গিয়ে শেখাচ্ছি জি ফর গণেশ। তাহলেই দেখবেন আমরা হয়ে যাব অ-ধর্মনিরপেক্ষ, আমাদের গৈরিকীকরণের অজুহাতে দোষারোপ করা হবে। অথচ আমরা যদি শেখাই জি ফর গাধা, তাহলে আমরা কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ। এটা তো ঠিক নয়। আমরা খালি আমাদের সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নতি করতে চাইছি। অন্য রাজনৈতিক দলের যে বন্ধুরা আমাদের গৈরিক-পন্থী বলে কটাক্ষ করছেন তাঁদের জানা উচিত যে ভারতবর্ষের মানুষ জানেন আমরা কোন ভাবাদর্শ নিয়ে চলি এবং তাঁদেরই ভোটে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে আমরা ক্ষমতায় এসেছি।'

সমীক্ষা বলেছে বিহারে এগিয়ে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আর এক মাসও বাকি নেই বিহারের ভোটযুদ্ধ শুরু হতে। ইন্ডিয়া টুডে-তে প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমারেখা ঘেঁষে হলেও বিজেপি জয়ের মুখ দেখতে পারে। এনডিএ পাবে ১২৫টি আসন যা গতবারের তুলনায় ৩১টি বেশি। অন্যদিকে বিহার নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী জেডিইউ-এর বিজয়রথকে ১০৬টি আসনেই আটকে দেবে বিজেপি। বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতিশকুমার নিজে দুর্নীতিপরায়ণ না হলেও তাঁর দল ও সরকার দুর্নীতির দোষে দুষ্ট। তাছাড়া কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নীতিশের দুর্বল পদক্ষেপে এবার তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা। তবে বরাবরের মতো এবারও উচ্চবর্ণের ৭০-৭৭ শতাংশ ভোট বিজেপির ঝুলিতেই যাবে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি'র জয়জয়কার

জে এন ইউ-তে সহ-সম্পাদকের পদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরপর দু'বার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে নিজেদের অস্তিত্ব আরও একবার প্রমাণ করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। এই নির্বাচনের ফলাফল বের হতে হিসেবটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত সেপ্টেম্বর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি-র প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই। তবে এই নির্বাচনে সকলের নজর ছিল দিল্লীর ক্ষমতায় থাকা আম আদমি পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্রযুব সংঘর্ষ সমিতির দিকে। এবারই তারা প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নেয়। কিন্তু এবিভিপি-র সামনে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় তারা। যা হয়তো ঘুণাক্ষরে আশা করেননি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক চারটি পদই নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবিভিপি। প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে এন

সত্যেন্দ্র আওয়ানা *সানি দেধা* *অঞ্জলি রানা* *ছত্রপাল যাদব*

এস ইউ আই দ্বিতীয় এবং আপ পার্টির সি ওয়াই এস এস তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই নির্বাচনে প্রদত্ত ভোট ৪৩.৩ শতাংশ যা গতবারের তুলনায় কিছুটা হলেও কম। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ২০ হাজার ৪৩৯টি ভোট পেয়ে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন সত্যেন্দ্র আওয়ানা। পাশাপাশি সহ-সভাপতি পদে জিতেছেন সানি দেধা, সম্পাদক অঞ্জলি রানা এবং যুগ্ম-সম্পাদক ছত্রপাল যাদব।

তবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে শাসকদল আম আদমি পার্টির ছাত্রসংগঠন যে কোণঠাসা হয়ে পড়বে তা কখনই আশা করেননি সেই দলের প্রথম সারির নেতারা। ক্ষমতায় থাকা ৬ মাস হলেও রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের কাছে দলের গ্রহণযোগ্যতা যে কমে আসছে তা এই নির্বাচনী ফলাফল দেখে অনুধাবন করা যায়। এই নির্বাচনে দিল্লীতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ভাবমূর্তি চুপসে গেছে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সহ-সম্পাদকের পদ জিতেছে এবিভিপি। যেখানে গত ১৪ বছর ধরে নিরঙ্কুশভাবে ছাত্র সংসদ দখলে রেখেছিল বাম ছাত্রসংগঠন আইসা। কিন্তু এবার তার পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে এবিভিপি। গত ১২ সেপ্টেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জে এন ইউ-তে। ১৩ সেপ্টেম্বর তার ফলাফল বের হতে দেখা যায় আইসার প্রার্থীকে ২৭ ভোটে হারিয়ে সহ-সম্পাদকের পদে জেতেন এবিভিপি-র সৌরভ কুমার শর্মা। সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ জিততে না পারলেও ভোটপ্রাপ্তির নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এবিভিপি। স্বভাবতই এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে এবিভিপি-র ভালো ফলে উচ্ছ্বসিত এরাজ্যের এবিভিপি-ও চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বেশ কিছু কলেজেও এবিভিপি-র ফল ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই এবিভিপি-র এই উত্থানে অন্য দলগুলির কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দুরা ভারতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন, এদেশে আসা উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা হবে। উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর সেই আশ্বাস সম্প্রতি বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে যে সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা অর্থাৎ হিন্দুরা ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা এদেশে থাকতে পারবেন। তাঁদের আর কোনো আশঙ্কার কারণ নেই। উল্লেখ্য, বিজেপি বরাবরই বলে এসেছে ওই দুই দেশ থেকে আগত হিন্দুরা শরণার্থী, বাকিরা অনুপ্রবেশকারী। যদি কেউ বৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে ভারতে প্রবেশ করে থাকেন, তাঁদের ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তাঁরা মনে করলে এদেশে থেকে যেতে পারেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া কেউ এদেশে প্রবেশ করে থাকলেও তাঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গণ্য করা হবে না। পাসপোর্ট আইন (ভারতে প্রবেশ) ১৯২০ এবং বিদেশি নাগরিক আইন ১৯৪৬-এর আওতায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই খবর জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

এই সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতে আসা মুসলমানদের বেআইনি বসবাসকারী হিসাবেই বিবেচনা করা হবে। এবং তারা চিহ্নিত হলে গ্রেপ্তার তথা পুশব্যাক করা হবে। তবে তাদের কীভাবে চিহ্নিত করা হবে তা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কিছু জানায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার চেষ্টা রাজ্যে রাজ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেও দেশের রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবসায়িক পরিকাঠামোর দিক থেকে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে এক সুস্থ প্রতিযোগিতার আবহ গড়ে উঠছে দেশে। নিজ রাজ্যে বিনিয়োগ টানতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ন্যূনতম সময়ে লাইসেন্স ইস্যু করা, কর জমা দেওয়া বা গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগের ব্যবস্থা করে ব্যবসায়ীরা যাতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিভাষায় 'ইজি অফ ডুইং বিজনিস' বা সহজে ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারেন সে চেষ্টায় কোনো কসুর করছে না রাজ্যগুলি। এর মধ্যে দূষণ ও শ্রম দপ্তরও তাদের পরিদর্শনের ক্ষেত্রে যাতে সহজ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে পারে রাজ্য সরকারগুলি সে বিষয়েও সচেষ্ট।

খুব শিগগিররই বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফে দেশে 'ব্যবসায়িক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠিতে কোন রাজ্য বেশি এগিয়ে আছে সেই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় সামনের সারিতে থাকতে সব রাজ্যেই সাজোসাজো রব। সকলেই বিস্মিত রাজ্যে রাজ্যে এই প্রথম এমন কোনো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হওয়ায়। যে রাজ্য যতটা ব্যবসা বন্ধু ভাবমূর্তি প্রদর্শন করতে পারবে তারই বেশি লাভ। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন রাজ্যের পরিসংখ্যান যাচাই করে তাঁদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ সুবিধেজনক রাজ্যেই শুরু করবেন। সূত্র অনুযায়ী অনেক রাজ্যেই নির্মাণ শিল্পে পারমিট দেওয়া বা সম্পত্তি নথিভুক্ত করানোর কাজ অনেক সরল করা হয়েছে।

যদিও এই নির্বাচন নানান মানদণ্ডের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত হবে, তবে মোটামুটিভাবে ১০টি প্রাথমিক গুরুত্বের নিরিখে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্য ইতিমধ্যেই প্রথমসারিতে উঠে এসেছে। ওয়াকিবহাল মহলের তথ্য অনুযায়ী এমন অনেকগুলি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অনেক রাজ্যই যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। অনেক রাজ্যই এখন যখন-তখন পরিদর্শনের (র‍্যানডাম ইনসপেকশন) দাবি জানাচ্ছে। অনেকেই ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যের তরফে সম্প্রতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত রিপোর্ট 'আপলোড' করে দিচ্ছে। এই মর্মে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এক জানালা (ওয়ান উইন্ডো) পদ্ধতিতে মাত্র ২১ দিনের মধ্যে যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ছাড়পত্র মঞ্জুর করছে। নিচে কয়েকটি রাজ্যের পরিসংখ্যান দেওয়া হলো :

(১) গুজরাট :

(ক) একদিনে ভ্যাট সার্টিফিকেট প্রদান।

(খ) ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সরকারের তরফে পরিদর্শন (ইন্সপেকশান) রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।

(গ) অন লাইনে বিলাস ও প্রমোদ কর পরিবেশ ও দূষণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদান করা চালু হয়েছে।

(২) মহারাষ্ট্র :

(ক) বিদ্যুৎ সংযোগের সময়সীমা ৬৭ দিন থেকে কমিয়ে ১৫ দিনে ধার্য হয়েছে।

(খ) ১৬টি শ্রম আইন মেনে চলার ক্ষেত্র নিজ প্রশংসাপত্রই যথেষ্ট বলে ধরা হচ্ছে।

(৩) মধ্যপ্রদেশ :

(ক) কারখানার লাইসেন্স ৫ বছরের আগে পুনর্নবীকরণ করতে হবে না।

(খ) সরকারের পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার সময়সীমা মাত্র ৭২ ঘণ্টা।

(৪) উত্তরপ্রদেশ :

(ক) অন লাইনে এক জানালা পদ্ধতিতে শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত বহু ছাড়পত্র দেওয়া চালু হয়েছে।

(খ) বিভিন্ন শ্রম আইনের ছাড় পত্র দেওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা ৭২ ঘণ্টা নির্ধারিত।

রাজ্যে রাজ্যে এই ধরনের শিল্পবন্ধু পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রতিযোগিতামূলক প্রচেষ্টা অতীতে দেখা যায়নি বলে তথ্যাভিজ্ঞমহলের ধারণা।

আই এস-এ ভারতীয়দের যুক্ত করার দায়ে ধৃত আফসা জোশেফ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১১ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদ থকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আই এস)-এ ভারতীয় ছেলেমেয়েদের নিযুক্ত করার দায়ে আফসা জোশেফ ওরফে নিকি জোশেফ (৩৮)-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও বৃটেনে দীর্ঘ ন'মাস ধরে তার উপর নজরদারি চালানো হয়েছিল। সৌদি আরব থেকে স্বামী-সন্তানসহ ভারতীয় মাটিতে পা রাখা মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফেসবুকে প্রথম বিভিন্ন ইসলামিক সাহিত্য ও প্রোপাগাণ্ডা পাঠিয়ে ভারতীয় যুবক-যুবতীদের সে উদ্বুদ্ধ করতো এবং পরে ওই দলে যোগ দিতে বাধ্য করত। আই এস-এ যোগ দিতে যাওয়া ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার সলমন মহিউদ্দিনের গ্রেপ্তারির যোগসূত্র ধরেই ২০১৫-র ১৬ জানুয়ারি প্রথম আফসার নাম উঠে আসে। সে সলমনকে দুবাইয়ে বসবাসরত এক বৃটিশ নাগরিক হিসাবে পরিচয়পত্র পাইয়ে দিয়েছিল। ভারতীয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আফোরালি পলকে সে বিয়ে করেছে। মাত্র চার বছর বয়সে আফসা তার পরিবারের সঙ্গে ভারতবর্ষ ছেড়ে দুবাইয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

মিসাইল প্রুফ দেশ হওয়ার পথে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সেই সময় আসতে আর বেশি দেরি নেই যখন পাকিস্তান ভারতকে পরমাণু হামলার হুমকি দেওয়ার আগে হাজার বার ভাববে। সেইদিন আসতেও বেশি দেরি নেই যেদিন ভারতের সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামার সাহসও দেখাতে পারবে না চীন। কারণ খুব শীঘ্রই সম্ভবত বিশ্বের প্রথম পুরোপুরি মিসাইল প্রুফ দেশ হতে চলেছে ভারত। সূত্রের খবর, একবিংশ শতাব্দীর সবথেকে উন্নতমানের মিসাইল ধ্বংসকারী অস্ত্র তৈরিতে মনোনিবেশ করেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। যাতে প্রাথমিকভাবে সাফল্যও এসেছে। মিসাইল বিধ্বংসী এই অস্ত্রের নাম রাখা হয়েছে 'কালী'। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই অস্ত্রের পুরো নাম 'কিলোঅ্যাম্পায়র লিনিয়রইনজেক্টর'। যাকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে কালী'। কোনোদেশ ভারতের দিকে তাক করে কোনো মিসাইল হামলা চালালে তা দেশের সীমান্তে প্রবেশের আগে মাঝপথেই ধ্বংস করে দেবে 'কালী'। এক নয় একাধিক মিসাইল একইসঙ্গে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই অস্ত্র। এই মিসাইলবিধ্বংসী অস্ত্রের মধ্যে রিলেটিভিস্টিক ইলেকট্রনসবিমস প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যাচ্ছে। যা যে কোনো মিসাইলের গতিপথকে মুহূর্তের মধ্যে ট্রাক করতে পারবে। মিসাইল চিহ্নিত হওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হবে 'কালী'। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ইলেকট্রিকাল মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে মিসাইল ধ্বংস করবে 'কালী'। প্রতিটি মাইক্রোওয়েভ জিগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ বহন করবে (এক জিগাওয়াট অর্থাৎ এক হাজার মিলিয়ন ওয়াট বিদ্যুৎ)। শুধুমাত্র মিসাইল নয় শত্রুপক্ষের যে কোনো ধরনের যুদ্ধবিমানকে মাঝ আকাশে ধ্বংস করে দেবে 'কালী' থেকে নির্গত মাইক্রোওয়েভ। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বলছেন, যে কোনো লেজার অস্ত্র থেকেও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন হতে চলেছে 'কালী'। সূত্রের আরও খবর এই মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে মাইক্রোওয়েভগান তৈরি করার কথাও ভাবা হচ্ছে। 'কালী' বিখ্যাত গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে ভারতের এই প্রযুক্তি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আর্কিমিডিস যেভাবে সূর্যের আলোক ব্যবহার করে একটি রোমান যুদ্ধজাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কালীর প্রযুক্তি অনেকটাই সেই ধরনের। এক্ষেত্রে সূর্যের আলো নয় বিদ্যুৎকে কাজে লাগানো হবে। জানা গিয়েছে ১৯৮৫ সালে এমন একটি মিসাইলধ্বংসকারী অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন তৎকালীন বি.এ.আর.সি. (ভাবাঅটোমিক রিসার্চ সেন্টার) ডিরেক্টর আর. চিদম্বরম। পরিকল্পনার ঠিক চার বছর পরেই এই অস্ত্র তৈরির কাজ শুরু করেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। সূত্রের খবর, আর চিদম্বরমের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পরীক্ষায় 'কালী' সফল হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ২০১২ সালে সিয়াচেনে প্রাথমিক টেস্ট করা হয়েছিল। এই টেস্টের জেরে সিয়াচেন সংলগ্ন পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় একটি ধসের সৃষ্টি হয়। যে ধসে ১৩৫ জন পাকসেনার মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি করে পাক সংবাদমাধ্যম। পাক সংবাদ মাধ্যমের আরও দাবি ছিল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি ইলেকট্রন ঘাতক রশ্মির জেরেই সিয়াচেনে ওই মারণ ধস নেমেছিল। ভারতীয়সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে একই ধরনের প্রযুক্তি তৈরি করার চেষ্টা করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। কিন্তু মার্কিনি বিজ্ঞানীরা সাফল্যের মুখ দেখতে পাননি। অন্যদিকে ভারত এই প্রযুক্তি তৈরিতে একেবারে সাফল্যের দোরগোড়ায় বলে খবর।

হিন্দু-জীবনের অবৈজ্ঞানিক দিকগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে : মোহনরাও ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মরুশহর জয়পুরে 'ইন্ডিয়ান পারস্‌পেকটিভস্ অন উইমেনস্ ইস্যুস' শীর্ষক স্তম্ভলেখকদের সম্মেলনে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত হিন্দুধর্মের অবৈজ্ঞানিক দিকগুলি আঁকড়ে না ধরে

পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুধর্মের মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমন দিকগুলিকে বর্জন করতে হবে। ভারতীয় সমাজ কালবাহ্য বিষয়গুলিকে পরিত্যাগ করে শাশ্বত মূল্যবোধভিত্তিক মঙ্গলকর সকল বিষয়ই সারাবিশ্ব থেকে গ্রহণ করে। হিন্দু পরিবার-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, হিন্দু-জীবন ধারায় পুরুষ এবং মহিলাকে একই সত্তার দুটো প্রকাশরূপে দেখা হয়। তাই হিন্দু দর্শন নারী ও পুরুষের মধ্যে সমানতা (ইকোয়ালিটি)-র পরিবর্তে ঐক্যের (ইউনিটি) উপর জোর দেয়। ভারতবর্ষে পরিবার ভাবনার মূল্যবোধ ও গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন যে বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়েও এই পরিবার প্রথা দৃঢ়ভাবে আজও বজায় আছে যা হিন্দু সমাজের ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। নিজেদের শিকড়কে ভালো করে জানা এবং তা শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে পাশ্চাত্যকরণ-সহ অন্যান্য আক্রমণের প্রতিরোধ করা যায়। হিন্দু দর্শনই সবদিকে ভারসাম্য বজায় রেখে নতুন নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

ইসলামিক স্টেট পশ্চিম এশিয়াকে খতম করছে, ভারত মোটেই নিরাপদ নয়

পশ্চিম এশিয়ার প্রায় ৭০ লক্ষ মুসলমান শরণার্থীর বিপুল জনস্রোত ইউরোপের অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। সিরিয়া-ইরাকের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ ছেড়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দফায় শরণার্থীদের ঢেউ আছড়ে পড়বে ইউরোপের সমুদ্রতটে। এই জনস্রোত বন্ধ করতে গেলে একমাত্র পথ ইরাক-সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো। সহজে তা সম্ভব নয়। কারণ, সেখানের সুন্নি মুসলমানরা শান্তির বার্তা বোঝে না। তাদের জেহাদি সংগঠন 'ইসলামিক স্টেট' রাইফেলের বুলেটের ভাষাই বোঝে। 'ইসলামিক স্টেট' পশ্চিম এশিয়াকে খতম করছে বলে আমরা নিরাপদ তা মোটেই নয়। ইসলামিক স্টেটের সর্বাধিনায়ক আবু বকর আল বাগদাদি ঘোষণা করেছে যে, এশিয়ায় ভারতকে তারা মুসলিম দেশ করবে। সেই যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়ে গেছে।

শরণার্থী সঙ্কটে খৃষ্টান-ইউরোপের অস্তিত্ব বিপন্ন বলে মন্তব্য করেছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর গুরবান। কথাটা মানবতা বিরোধী মনে হলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শরণার্থীদের দলে ভিড়ে আই এস জঙ্গিরাও যে ঢুকে পড়ছে না তার গ্যারান্টি দেবে কে? বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ঢল নেমেছিল পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরায়। তারপর ৪৪ বছর কেটে গেছে। শরণার্থী সমস্যা মেটেনি। শুধু নামটা পালটে এখন বলা হয় অনুপ্রবেশকারী। ভারত একদা মানবিকতার খাতিরে এদের সাদরে আশ্রয় দিয়েছিল। ভাবা হয়েছিল স্বাধীন

গূঢ় পুরুষের

কলম

বাংলাদেশ গঠিত হলে, শান্তি ফিরলে শরণার্থীরা দেশে ফিরবে। আশ্রয় শিবিরে থাকা মানুষজন বাংলাদেশে ফিরে গেলেও একটা বড় অংশ তাদের আত্মীয় বন্ধু পরিজনদের কাছে থেকে যায়।

ইরাক-সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শেষ হতে কত সময় লাগবে জানা নেই। তবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ চাইলে তিন মাসের মধ্যে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরতে পারে। সারা বিশ্বে একমাত্র সৌদি আরব ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাষ্ট্র আই এস জঙ্গিদের প্রকাশ্যে সাহায্য করছে না। তবু রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিশ্চুপ। কেন? রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পর্ষদের শক্তিধর রাষ্ট্র-সদস্যদের একজন প্রতিনিধিও পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করার কথা বলছে না। এর একটা কারণ তেল। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম চড়া। চোরাবাজারে সস্তায় তেল কিনছে আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্স। পশ্চিম এশিয়ায় সঙ্কট যতদিন চলবে ততদিন চোরাবাজারে রমরমা চলবে।

ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলসমৃদ্ধ শহর এলাকা মসুল। এই মসুল গত দুই বছর ধরে আই এস জঙ্গিদের কব্জায়। বাস্তবে ইরাকের ৯০ শতাংশ তেলের খনি এখন জঙ্গিদের কবলে। জঙ্গিরা এই তেল জলের দামে চোরাবাজারে বেচছে। চোরাবাজারে তেল বেচার কাজে সাহায্য করছে সৌদি আরব। এই তেল বেচার টাকা দিয়ে অস্ত্র কিনছে আই এস জঙ্গিরা। সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা চায় না যে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরুক। আমেরিকার যুদ্ধবাজ নেতারা, তা তিনি জর্জ বুশ হোন বা বারাক ওবামা, একদা গ্লোবাল টেররিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ইরাকে সাদ্দাম হুসেন রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করছে এই মনগড়া অভিযোগে সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। অথচ এখন আই এস জঙ্গিরা অবাধে মারাত্মক সারিন গ্যাস ব্যবহারে করছে তার বিরুদ্ধে আমেরিকার জনপ্রিয় মুসলমান রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা নীরব। ইউ এস সেক্রেটারি অফ স্টেট জন কেরি এক বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন, মৃতদেহের চুল ও রক্ত পরীক্ষা করে সারিন গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। সিরিয়াতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে ১১ই মার্চ, ২০১১। এখনও পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ১ লক্ষ সাধারণ মানুষ।

সরকারি কর্মচারীরা মহাখুশি পুজোয় দিদির উপহার 'ডিএ' টুপি

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

সত্যি দিদি আপনার জবাব নেই। আরও একবার আপনার ভাই হিসেবে গর্ববোধ করছি। অনেকে বলছে আপনি টুপি পরিয়েছেন। আমি বলি টুপি পরানোও যে শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তা আপনি দেখিয়ে দিলেন। রাজ্যে শিল্প আসুক না আসুক আপনার 'টুপি শিল্প' সত্যি উপভোগ করার মতো।

রাজ্যের কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ৫৪ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ায় কর্মচারীদের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। সেই ক্ষোভকে যাতে বিরোধীরা রাজনৈতিক হাতিয়ার করে তুলতে না পারে, তার জন্য একটা উপায় খুঁজছিলেন আপনি। এমন একটা উপায়, যাতে সাপ মরে কিন্তু লাঠি না ভাঙে। তারপর সত্যি সত্যিই সেই উপায় বের করে দেখালেন। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য কনভেনশনে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করে দিলেন। সবাই হাততালি দিয়ে বাড়ি চলে গেল। প্রাথমিকভাবে বুঝতেও পারল না আপনি সত্যি সত্যিই টুপি পরিয়ে দিয়েছেন। বিরোধীদলের নেতারাও অনেকক্ষণ বুঝতেই পারেনি এটা ডিএ টুপি। জানুয়ারি মাসে যে ডিএ কার্যকর হবে, তা আগেভাগেই ঘোষণা করে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভে জল ঢেলে দিলেন।

আমি সেদিন আপনার বক্তৃতা আগাগোড়া মন দিয়ে শুনেছি। আপনি যখন ঘোষণা করলেন, জানুয়ারি মাস থেকে ১০ শতাংশ ডিএ কার্যকর হবে তখন সমবেত জনতার সে কী হাততালি! তখনও তো কেউ বুঝতে পারেনি এই জানুয়ারি গত জানুয়ারি নয়, আগামী জানুয়ারি। বকেয়া টকেয়ার কোনো গল্প নেই। জানুয়ারি মাস থেকে যে ১০ শতাংশ ডিএ বাড়বে তা সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা করে দিয়েছেন সেটা বুঝতেই পারেনি প্রথম ধাক্কায়।

এই মুহূর্তে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ ৫৪ শতাংশ। জানুয়ারি থেকে আরও ১০ শতাংশ ডিএ পেলে, বকেয়া ডিএ কমে দাঁড়াবে ৪৪ শতাংশ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার জানুয়ারিতে আরও কয়েক শতাংশ ডিএ ঘোষণা করতে পারে। এটা হলে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ফের ৫০ শতাংশের আশপাশেই থাকবে। তাছাড়া, জানুয়ারি মাসে এমনিতেই রাজ্য সরকার ডিএ ঘোষণা করত। কেননা, এবছরের শুরুতে, জানুয়ারি মাসে ডিএ ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু ২০১৬-র জানুয়ারির কয়েক মাস আগে এই ডিএ ঘোষণা করে বিক্ষুব্ধ সরকারি কর্মচারীদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে আপনি সত্যিই মাত করে দিলেন।

সেদিন দেখলাম সমাবেশে আপনার সামনেই আপনার দলেরই সরকারি সংগঠনের সদস্যদের কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। আমার তো দেখেই মাথা গরম হয়ে গেছিল। আপনিও দেখলাম কিছুটা মেজাজ হারিয়ে ফেলেছেন। দিদি, আপনার হুঙ্কারও কিন্তু দারুণ ছিল, ''আমি যেমন মানবিক। তেমনই আমি খুবই রাফ অ্যান্ড টাফ। আমি যেটা পারবো সেটা করবো। যেটা পারবো না, সেটা বলবো না। এককেটা ভোট এলেই কেন্দ্র ডিএ ঘোষণা করে দেয়। আজ আমি এমন কিছু করবো না যা দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের ৫-৬ মাস খুব ভালো কাটলো, তারপর তাঁরা আমায় ভোট দিলেন, আর তারপর এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো যে ১০ বছর তাঁরা আর খেতে পেলেন না।'' হাততালি হাততালি। যারা কিছুক্ষণ আগেও ক্ষোভ প্রকাশ করছিল তারাও হাততালিতে ভরিয়ে দিল। আর একেবারে শেষে বুঝতেও পারল না আপনি ওদের সঙ্গে ডিএ-র নামে প্রতারণা করেছেন।

আসলে দিন দিন জিনিসের দাম যা বাড়ছে তাতে মধ্যবিত্তেরই সংসার চালানো দায় হয়ে গেছে। যারা সমাবেশে এসেছিল তাদের অনেকেরই নুন আনতে পান্না ফুরায় অবস্থা। তাই সমাবেশের শুরুতেই বেড়াতে যাওয়ার যেসব গল্প শুনিয়েছেন তাতেই ওদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালির বেড়াতে যাওয়ার জায়গা মানে 'দীপুদা'—দীঘা, পুরী, দার্জিলিং। সেখানে আপনি ব্যাঙ্কক, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর যা শুনিয়েছেন তাতে সিনেমায় ওই সব দেশের দৃশ্য দেখা বাঙালি কেরানির মাথা ঘুরে গেছিল। এলটিসি (লিভ ট্রাভেল কনসেশন)-র পাশাপাশি এইচটিসি (হোম ট্রাভেল কনসেশন)-র চালু করার ঘোষণাও করেছেন আপনি। সরকারি কর্মচারীরা প্রতি ৫ বছর অন্তর এইচটিসি পাবেন। রাজ্যের যে কোনো জায়গায় পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়া পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। রাজ্যের বাস, রাজ্যের গেস্ট হাউস ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা। আর প্রতি ১০ বছর অন্তর সরকারি কর্মচারীরা দেশের যে কোনো প্রান্তে অথবা সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্ককক, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশেও ভ্রমণে যেতে পারেন। এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার গাড়িভাড়ায় ছাড় দেবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকা-খাওয়ার খরচ কে দেবে দিদিভাই?

— **সুন্দর মৌলিক**

জাতীয়তাবাদ বনাম মেরুকরণের রাজনীতি

দেবব্রত ঘোষ

আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এক অভিনব স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক জোট তৈরি হয়েছে, যেখানে লালুপ্রসাদ যাদব, নীতিশ কুমার ও সোনিয়া গান্ধীর মতো ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও তাদের দলগুলো, বিপরীত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে আস্থাবান বামপন্থী দলগুলো এক মহাজোট তৈরি করেছে। এই জোটের প্রচ্ছন্ন স্লোগান বিজেপিকে আটকাও, যার অর্থ মুসলমান ভোটব্যাঙ্ককে নিজেদের দিকে টেনে নাও এবং জাতপাত ভিত্তিক সংকীর্ণ রাজনীতিকে অবলম্বন করে দেশকে দুর্বল করে দাও।

লালুপ্রসাদের রাজনীতি হলো যাদব বনাম বর্ণহিন্দু ভোট। নীতিশ কুমারের রাজনৈতিক আদর্শ হলো কূর্মি সম্প্রদায়ের ভোট বনাম উচ্চবর্ণের হিন্দুভোট। এই দুই নেতার একটা জায়গায় মিল রয়েছে। সেটা হলো নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ। নেহেরু-গান্ধী পরম্পরার যোগ্য উত্তরসূরী সোনিয়া গান্ধী তাঁর শ্বশুরকুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলমান তোষণ করেন। কমিউনিস্টরা তো জন্মলগ্ন থেকেই ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হলেও আল্লায় বিশ্বাসী এবং পাকিস্তানের দুই প্রবক্তা জিন্না ও কবি ইকবালের বিভেদকামী রাজনীতির উত্তরসূরী। তাঁরা আগেও একমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন, এবারে হলেন বিহারে।

ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিহারের একদা-গান্ধী অনুগত জয়প্রকাশ নারায়ণ তৎকালীন জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্রপার্টি-সহ আরো কয়েকটা দলের সম্মিলিত ফ্রন্ট তৈরি করেছিলেন যার নাম ছিল জনতাপার্টি এবং জয়প্রকাশের নেতৃত্বে জনতা পার্টি ইন্দিরার কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। জয়প্রকাশের ভাবশিষ্য লালুপ্রসাদ যাদব আজ সেই ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রবধূ বিদেশিনী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে হাত মেলালেন নিজের ব্যক্তিস্বার্থে। বিহারে জাতিদ্বন্দ্ব ভয়াবহ এবং বিহারি মুসলমান সম্প্রদায় প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী মৌলবাদী। এরাই লালু-নীতিশের ভোটব্যাঙ্ক, এমনকী সোনিয়ারও।

জমি অধিগ্রহণের যে নীতি নরেন্দ্র মোদী গ্রহণ করেছিলেন তার রূপায়ণ ঘটলে সারা দেশে শিল্পায়ন হোত, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও উন্নতি হোত। কিন্তু দিনের পর দিন সংসদ অচল করে রাজ্যসভায় সংখ্যাধিক্যের সুযোগে জমি বিল পাশ করতে দিল না কংগ্রেস-লালু-নীতিশ-বামফ্রন্ট-তৃণমূলের এই মহাজোট। অতএব জমি অধিগ্রহণ এবং তৎপরবর্তী শিল্পোন্নয়ন শিকেয় উঠল। মজার কথা, এটাই যে সেই মহাজোট যারা দেশে শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না বলে মোদী ও বিজেপিকে দোষ দেবে। গদি ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ এবং উচ্চাভিলাষী লালু-নীতিশ-সোনিয়া-বাম ক্ষমতা দখল করতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মেলাবে, নিম্নবর্ণের হিন্দু, যাদব, কূর্মি, ভূমিহার দলিত এবং আরও বহুধাভাগে বিভক্ত সমাজকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিপরীত স্রোতে চালনা করবে এই জোট এবং উন্নয়ন প্রকল্পকে কোনও রকম গুরুত্ব না দিয়ে সংকীর্ণ প্রাদেশিক রাজনীতি করবে জাতীয়তাবাদকে জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণের পথে। কোনো আঞ্চলিক দলই যথার্থ জাতীয়তাবাদী হতে পারে না। শিবসেনা বা আকালি দল কিছুটা ব্যতিক্রম। কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মারাঠা এবং শিখেরা বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, পাঠান-মোগল- লৌদি-খিল্‌জি বংশের সময়ে অর্থাৎ ভারতে মুসলমান শাসনকালেও মারাঠা এবং শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা ইসলামি অপশাসনের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছে। জাতীয়তাবাদী একটা ঐতিহ্য এই দুই জাতির মধ্যে ছিল বলেই মারাঠা প্রধান শিবসেনা ও শিখপ্রধান আকালি দল জাতীয়তাবাদী দলের তক্‌মা পেতে পারে। ইতিহাস প্রমাণ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ফাঁসির মঞ্চে যে ১৩৯ জন বিপ্লবীর ফাঁসি হয়েছিল তাদের মধ্যে মাত্র ১ জন মুসলমান ছিলেন, যাঁর নাম আসফাক্‌উল্লা।

যে মুসলমান সম্প্রদায় বৃটিশের

মুসলমান হিসেবে পেয়েছেন শিল্পী হিসেবে পাননি। অথচ আমাদের দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা অকারণে মুসলমান তোষণ করেন। লালু-মুলায়ম-মায়াবতী-সোনিয়া এদেরই পথিকৃৎ এবং অতি অবশ্যই কমিউনিস্টরা।

মুসলমান শাসকেরা ভারতবর্ষে অসংখ্য মন্দির ভেঙেছে, লুণ্ঠন করেছে---মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী, সোমনাথ, উজ্জয়িনী সর্বত্রই (এই প্রতিবেদকের একটা তথ্য সম্বলিত বিশেষ নিবন্ধ স্বস্তিকা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল)। মুসলমানরা এদেশে বহিরাগত হিসেবেই এসেছে, বহিরাগত হিসেবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ করেছে, বলপূর্বক ধর্মান্তর করেছে। খৃষ্টানরাও পিছিয়ে ছিল না খুব একটা। ভারতের সামগ্রিক দারিদ্র্য ও দুরবস্থার জন্য মুসলমান ও খৃষ্টান শাসন সমান দায়ী। এই ইতিহাস সোনিয়া জানেন না, কারণ তিনি ভারতীয় নন। এই ইতিহাস লালু-মুলায়াম-নীতিশকুমার জেনেও জানেন না। তাঁরা শুধু জানেন তাঁদের ভোটব্যাঙ্ক অক্ষত রেখে গদিতে বসে পরবর্তী বংশধরদের ক্রোড়পতি করে দেবার পথ প্রশস্ত করতে।

বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের কোনো অবদান ছিল না, থাকলেও খুবই নগণ্য (আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুসলমানদের বাদ দিলে) তারা কিন্তু নিজেদের জন্য আলাদা একটা Home Land আদায় করে নিয়েছিল--- সৌজন্যে নেহরু-গান্ধী। বিশাল হিন্দু সমাজ দেশের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে তারা কোনো হিন্দু হোমল্যান্ড পায়নি, পেলো এক ধর্মনিরপেক্ষ নামক অবাস্তব তত্ত্বভিত্তিক ভৌগোলিক রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব পেয়েছে, অথচ পৃথিবীর মুসলমান দেশগুলোতে সর্বত্র হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য এবং অত্যাচারিত। নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ যা ভারতে হয়, সারা বিশ্বে তা নজিরবিহীন।

ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মুসলমানদের অবদান কতটুকু? প্রয়াত এপিজে আবদুল কালামকে বাদ দিলে যে সব বিজ্ঞানী পড়ে থাকেন তারা তো সকলেই হিন্দু। নজরুলকে বাদ দিলে যাঁরা পড়ে থাকেন তারাও তো সবাই হিন্দু। একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, ব্রাহ্মধর্ম কিন্তু হিন্দুধর্মের একটা শাখামাত্র। কাজেই বাংলা তথা সারা ভারতের মনীষী তালিকায় রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ, শঙ্করাচার্য থেকে শ্রীচৈতন্য, রাণাডে থেকে শ্রীঅরবিন্দ সকলেই হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দু হিসেবেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে বহন ও সমৃদ্ধ করেছেন সে উদাহরণ বিরল। বিশেষ সুবিধেভোগী ও তোল্লাই প্রাপ্ত মুসলমানরা করেনি এমন কোনও নোংরা কাজ নেই। অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে যেমন কার্গিল যুদ্ধে ভারতের কিছু মুসলমান সেনানায়ক শহীদ হয়েছেন।

ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম-ই থেকে যায়। যে সব মুসলমান শিল্পী সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন (ওস্তাদ আলাউদ্দীন, আলি আকবর, বিসমিল্লা, বড়ে গোলাম বা আমীর খাঁ-র মতো সংগীত জগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিরা) তাঁরা কিন্তু আমাদের দেশে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর কাছে প্রাপ্য মর্যাদা পাননি, পেয়ে থাকলেও

কংগ্রেস তো জাতীয়তাবাদী দল। অন্তত তারা নিজেদের সেটাই বলে। কিন্তু কংগ্রেস কি সত্যিই জাতীয়তাবাদী দল? যদি তাই হোত তাহলে তারা দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করল কেন? এক জাতি, এক দেশ, এক আইন, এক বিচার—এটাই তো জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শর্ত। কংগ্রেস কিন্তু জাতীয়তাবাদ প্রসারের বদলে বিভেদকামী, এবং সোনিয়া-রাহুল সেই পথেই হেঁটে চলেছেন। অবশ্য লালু-মুলায়াম-নীতিশ-সিপিএম তাদের সহযাত্রী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাদের অনুবর্তী পথিক। এঁরা যেটা করছেন সেটা আর যাইহোক জাতীয়তাবাদ নয়, দেশপ্রেম নয়। এঁরা সমূহ সর্বনাশের পথে দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন। ■

পণ্ডিতরা যদি কোনো বিষয় যেমন— দাঙ্গা বিষয়ে তথ্য-সহ সবিস্তারে লিখতেন তাহলে দেখানো যেত মুসলমানদের ভারতবিরোধী কার্যকলাপের ভীষণতা, অবিরত দাঙ্গা বাঁধানোর প্রচেষ্টা এবং তার পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদীদের অসীম সহিষ্ণুতা।

মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি সাহেবের কাছে খোলা চিঠি

মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি সাহেব,

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের সংবাদপত্রে আপনার ভাষণ পড়ে কোনো মতেই মনোবেদনা চেপে রাখতে পারলাম না। মনে হলো আপনাকে বলি, 'এ তু ব্রুটে' ? ব্রুটাস তুমিও ? ৩১ আগস্ট তারিখে একটি সভায় আপনি বলেছেন, রাষ্ট্র ও তার এজেন্টরা মুসলমান সমাজকে বঞ্চনা করে চলেছেন, তাঁরা যথেষ্ট চাকরির ব্যবস্থা করছেন না, নিরাপত্তার ব্যবস্থা তো নয়ই। আপনার এই উক্তি শুনে বারে বারে মনে আসছিল পবিত্র কোরানের পৌনঃপুনিক উক্তি--- অমুসলমান অর্থাৎ কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না, তাদের প্রশংসা করবে না, মোট কথা সর্বদা একটা জেহাদের মানসিকতা জাগিয়ে রাখবে। মনে হলো আপনি পবিত্র কোরাণের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

তা না হলে এই উক্তি করতে আপনার গলা একবার কাঁপত। যদি মুসলমানরা সত্যিই বঞ্চনার শিকার হয় তাহলে আপনি কি উপরাষ্ট্রপতি হতে পারতেন ? ৬০ বছরে তিন জন মুসলমান রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। এটা কি বঞ্চনা ? প্রতিবেশী পাকিস্তান বা বাংলাদেশে কোনো হিন্দু রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হওয়া দূরের কথা রাজ্যপাল কি হয়েছেন ? পুলিশ তো বটেই মিলিটারিতে বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে উচ্চপদে নেওয়া হচ্ছে। প্রতিবেশী পাকিস্তান বা বাংলাদেশে উচ্চপদে ক'জন পুলিশ নেওয়া হয়েছে ? যতদূর জানি একজনও না। মিলিটারিতে তো নয়ই। সাচার কমিশন-সহ অনেক কমিশন ও সংগঠন মুসলমানদের চাকরি থেকে পিছিয়ে থাকার কথা বলেছে। ভারতের বিপুল সংখ্যক শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব এঁরা কি মুসলমানদের চেয়ে বেশি চাকরি পাচ্ছেন ? যাঁরা চাকরি পাচ্ছেন— তাঁরা বর্ণ হিন্দু হোন আর শিডিউল কাস্ট বা শিডিউল ট্রাইব হোন যোগ্যতা দেখিয়ে চাকরি পাচ্ছেন। ১৮৭০-৮০-র দশকে স্যার সৈয়দ আহম্মদ দাবি তুলেছিলেন, তাঁর পথ ধরে অনেক মুসলমান এখনও বলছেন---- পরীক্ষা-টরীক্ষা নয়, মুসলমানদের জন্য কোটা চাই। অদ্ভুত যুক্তি ! এ তো স্রেফ গায়ের জোর।

হ্যাঁ, হামিদ সাহেব, আপনি বলেছেন মুসলমানদের নিরাপত্তা নেই। একথা সমস্ত মুসলমানদের। কিন্তু মুসলমানরা ভারতে যদি এতই খারাপ অবস্থায় থাকেন, যদি তাঁদের নিরাপত্তা না থাকে তাহলে মুসলমানদের সংখ্যা কী করে বাড়ছে ? ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত লোক গণনার হিসেবে দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার বেশি এবং ভারত দ্বিতীয় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে বছরে কয়েক লক্ষ করে মুসলমান আসছে--- সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থোপার্জনের সুযোগ আছে বলেই তো ? অন্য পক্ষে, কী পাকিস্তান, কী বাংলাদেশে দু'দেশেই অমুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত শূন্যে নেমে আসছে। সেখানে সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থোপার্জনের সুযোগ নেই না ?

আরেকটা কথা, মুসলমানদের নিরাপত্তা যদি নাই থাকে তারা এত বোমা বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে কী করে ? গ্রামে গ্রামে কী করে প্রকাশ্যে মুসলমানদের জেহাদ করার লক্ষ্যে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ? মুখে মুসলমানরা এবং তাঁদের সহযোগী সিভিল রাইটস সমর্থকরা যাই বলুন,

দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি দাঙ্গার পিছনে মুসলমানদের হাত। এমনকী যে দাঙ্গা হিন্দুরা ঘটিয়েছে বলা হচ্ছে তার পিছনে রয়েছে মুসলমানদের উস্কানি। যে গোধরা-পরবর্তী দাঙ্গা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে হৈচৈ, তা ঘটেছে ঠাণ্ডা মাথায় ৪৯ জন করসেবককে পুড়িয়ে মারার জন্য। যে মজফফরপুর দাঙ্গায় কয়েকশো মানুষ মারা গিয়েছিল তার সূত্রপাত মুসলমানদের আক্রমণ থেকে। ভারতে প্রতি পদে পদে দাঙ্গার ইন্ধন যোগাচ্ছেন। হিন্দু নেতারা বহু ক্ষেত্রেই সেই প্ররোচনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। যেমন কিছুদিন আগে আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়েছিল। স্মরণ থাকতে পারে রাজা মহেন্দ্রর পূর্বপুরুষের দেওয়া জমিতে আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটি তৈরি হয়েছিল। মুসলমান ছাত্র তথা শিক্ষা কর্মীদের আপত্তিতে তা অন্যত্র উদযাপন করতে হয়। সরকার বা হিন্দু নেতারা জিদ করলে দাঙ্গা বাঁধত।

ভারতে কেউ মুসলমানদের একটুকু সমালোচনা করলে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে যেমন হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীকে। শুধু তালিমনাড়ুতে কয়েক বছর আগে এক বছরে ৫-৬ জন হিন্দুত্ববাদী ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল। কজন মুসলমান নেতাকে আর এস এস বা বজরঙ্গ দলের কর্মীরা হত্যা করেছে বা হত্যার হুমকি দিয়েছে? বাম তথা একদল মানবাধিকার নেতা অবিরত হিন্দুত্ববাদীদের গাল মন্দ করছেন। হিন্দুত্ববাদীরা যদি মুসলমান মৌলবাদীদের মতো আক্রমণাত্মক হতেন তাহলে এঁরা ভয়ে চুপসে থাকতেন। ভারতে প্রতিটি মুসলমান এলাকা এখন জেহাদিদের নিরাপদ আশ্রয়। নিরাপত্তা আছে বলেই তো? ঢালাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন বলেই এবং ভারতকে শত্রুর দেশ ভাবেন বলেই তো মাদ্রাসায় স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা তোলা হয় না। আরেকটা কথা, মুসলমানদের দোষত্রুটি নিয়ে কথা বললে তাকে 'হেট স্পিচ' বলা হয়, কিন্তু প্রতি শুক্রবার নামাজের পর মুসলমানদের উদ্দেশে ইমামরা যে দীর্ঘ ভাষণ (খতবা) দেন তা 'হেট স্পিচ'কে ছাড়িয়ে যায়। এই দীর্ঘ 'হেট স্পিচে' ইমামরা মুসলমানরা কীভাবে ইসলামের শুরু থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে সেটি অতি উত্তেজক ভাষায় বর্ণনা করেন এবং তাঁদের যে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা স্মরণ করিয়ে দেন। দেড়শো বছর আগে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থে এই কথা বলেছিলেন।

ভারতের মতো আর কোনো দেশে মুসলমানরা এত ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেন? অমুসলমান দেশ দূরের কথা মুসলমান দেশেও না। ভারতে হজ করার জন্য বছরে সরকার ৩০০ কোটি বা তার বেশি বরাদ্দ করছেন। পাকিস্তান বা বাংলাদেশে যতদূর জানি এক পয়সাও বরাদ্দ করা হয় না। হিন্দুরা অমরনাথ বা অন্য স্থানে তীর্থ করতে গেলে সরকার একটা পয়সাও দেয় না। শুধু তাই নয়, সরকার মাদ্রাসার জন্য ঢালাও অর্থ মঞ্জুর করছেন, অথচ সাধারণ মানুষ যেমন জানে তেমনি সরকারের গোয়েন্দা বিভাগও জানে মাদ্রাসাগুলি হলো জিহাদি তৈরির কারখানা। খোদ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে জিহাদি আক্রমণ হচ্ছে দেখে সে দেশের সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ জারি করেছে। ভারতে ইমামদের বেতন দেওয়া হয়, অথচ পুরোহিতদের বেতন নেওয়া হয় না। কবরের চারদিকে পাঁচিল দেবার জন্য এত বিপুল টাকা দেওয়া হয় যা ভাবা যায় না। ভারতে মুসলমান ছেলে ও মেয়েদের হাজার হাজার টাকা মূল্যের ল্যাপটপ ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী বিনামূল্যে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বিনা সুদে ব্যবসা করার জন্য অগ্রিম অর্থ। হিন্দু, শিখ বা জৈনরা কি এমন সাহায্য পায়? তথ্য ও প্রচার দপ্তর উর্দু পত্রিকার প্রসারের জন্য নিউজপ্রিন্ট ও বিজ্ঞাপন দেওয়ার লক্ষ্যে যে ঢালাও ব্যবস্থা করেছে তা বাংলা, হিন্দী, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার ভাগ্যে জোটে না। এসব কি মুসলমানদের অবহেলার লক্ষণ?

শুধু তাই নয়, মুসলমানরা এদেশে পারসোনাল ল' অক্ষত রাখতে বলছেন এবং সরকার অলিখিতভাবে তা মেনে নিয়েছে। কিন্তু পারসোনাল ল' যদি ঠিক ঠিক বজায় রাখতে হয় তাহলে তো তা ইসলামের নীতি অনুযায়ী আক্ষরিকভাবে তার প্রয়োগ করতে হয়— যেমন অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী পাথর ছুড়ে মারা, জ্যান্ত কবর দেওয়া, বেত মারা ইত্যাদি। মুসলমানরা তো সেই পথে যাচ্ছেন না?

মুসলমান নেতারা বলছেন তাঁদের সরকার পিছিয়ে রেখেছে, অথচ তাঁরা নিজেরাই পিছিয়ে থাকতে চাইছেন। তাঁরা তিন তালাক পদ্ধতি বজায় রাখবেন, চারটে স্ত্রী রাখবেন, মেয়েদের বোরখা পরাবেন এবং তাদের চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা চালু রাখবেন, সন্তান নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন না, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে যত্র তত্র মসজিদ বানাবেন (একটি হিন্দু মন্দির নির্মাণে যে ব্যয় হয় তার কয়েক হাজার গুণ খরচ হয় মসজিদ নির্মাণে এবং হিন্দু এলাকায় যত মন্দির আছে মুসলমান এলাকায় আছে তার দশ গুণ), লেখাপড়া ছেড়ে জিহাদের কথা চিন্তা করবেন। যদি হিসাব নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে ভারতে মুসলমানদের শিক্ষা ও আয়ের হার মুসলমানর দেশের চেয়েও বেশি, তেল সমৃদ্ধ আরবের থেকেও। একটি সমীক্ষায় বলছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের বেকারত্বের হার ১০.৩ শতাংশ। সাচার সাহেব কি এ নিয়ে ভেবেছেন? হামিদ সাহেব আপনিও কি ভেবেছেন? অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না।

চিঠি অনেক বড় হয়ে গেল। আপনাদের সৌভাগ্য এবং আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মতো হিন্দুদের দোষ দেখিয়ে মোটা মোটা বই লিখি না। আমাদের পণ্ডিতরা যদি কোনো বিষয় যেমন— দাঙ্গা বিষয়ে তথ্য-সহ সবিস্তারে লিখতেন তাহলে দেখানো যেত মুসলমানদের ভারতবিরোধী কার্যকলাপের ভীষণতা, অবিরত দাঙ্গা বাঁধানোর প্রচেষ্টা এবং তার পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদীদের অসীম সহিষ্ণুতা। এখানেই শেষ করি।

নমস্কারান্তে
কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী
৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

“আনসারি সাহেব তুষ্টিকরণের কোটায় উপরাষ্ট্রপতি হয়েছেন কিনা আমি জানি না। তবে ইতিহাস পড়ে একথা বুঝতে পারি যে তিনি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি হলেও তিনি সৈয়দ আহমেদ, স্যার মহম্মদ ইকবাল এবং মহম্মদ আলির চিন্তাধারার অনুসারী মাত্র।”

অকপটতার জন্য উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি সাহেব ধন্যবাদার্হ

অমলেশ মিশ্র

উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারির সাম্প্রতিক দিল্লীর কোনো একটি অনুষ্ঠানে একটি মন্তব্য নিয়ে অনেকেই একটু শোরগোল তুলেছেন। তাঁদের দৌড় ঐ সাফল্য শোরগোল তোলা পর্যন্তই। তাঁরা কখনো স্পষ্ট করে একথা বলার মেরুদণ্ড দেখাতে পারেন না, যে ইসলাম সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী। ১৯২০-২১ সালে খিলাফত আন্দোলন করার সময় কেউ কেউ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ভারতের ‘মুসলিম গোখেল’ মহম্মদ আলি জিন্নাহকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হাত ধরেছিলেন— মহম্মদ আলি ও তাঁর ভাই সওকত আলির, যাঁরা ছিলেন ইসলাম সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় প্রতিনিধি।

সেইদিন থেকেই তুষ্টিকরণের রাজনীতি চালু হয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িক খিলাফত আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বলে বিকৃত, অসত্য ইতিহাসও রচিত হয়েছে যা এখনও পাঠ্যপুস্তকে ছাত্রছাত্রীরা পড়েন আর রাজনীতির লোকেরা বক্তৃতা দেন।

একমাত্র আনসারি সাহেবই যে নিজস্ব সম্প্রদায় পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি তা নয়। হয়ত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি বিধায় তিনি যা গোপন করতে পারতেন তা করেননি। কিন্তু তিনি যা প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর স্বভাবগত সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ মাত্র। তিনি নীরবতার শর্ত ভঙ্গ করে কিছু অন্যায় করেননি। অতএব একজন ইসলামিক হিসাবে তিনি কিছু অন্যায় করেননি। অন্তত তাঁর বিবেকের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন, যা হিন্দু রাজনীতিকরা সাহস করেন না। কিন্তু তাঁর এই অভিব্যক্তি যাঁরা আড়াল করতে চাইছেন বা আড়াল করলে ভাল হোত বলছেন বা নীরবতা ভঙ্গ করে গর্হিত কাজ করেছেন বলে মনে করছেন, তাঁরাই ভুল করছেন।

একথা কে অস্বীকার করবেন যে ভারতের ইসলামিক নেতারা কখনও অসাম্প্রদায়িকতা দেখাননি। ইসলামি নেতারা অসাম্প্রদায়িক হলে তো দেশ বিভাগই হোত না। একথা কে অস্বীকার করবেন যে একজন ইসলামি নেতা জাতীয়তা বোধের থেকে ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধকে

বেশি গুরুত্ব দেন? অতএব হামিদ আনসারি ঠিক রাস্তাতেই আছেন। হয়ত মনের কথা বলে ফেলে একটু অশোভন কিছু করেছেন। কিন্তু অশোভন হলেই তা ভ্রান্ত এবং অন্যায় হবে, এমন সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

আমরা অধিকাংশরাই মনকে চোখ ঠারাই। দলের নেতৃত্ব বণ্টনে, প্রশাসনিক মন্ত্রিত্ব বণ্টনে, নির্বাচনে প্রার্থী চয়নের ব্যাপারে সর্বদাই মনে থাকে সাম্প্রদায়িকতার কথা। এবং এই সমস্ত বিষয়ে আমরা যা করি তা সাম্প্রদায়িক বিচারেই করি। মুখে হয়ত তা স্বীকার করি না। অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষতার ভেক ধরে আমরা নিজেদের অস্মিতা বিসর্জন দিয়ে ইসলামি নামাজেও অংশগ্রহণ করি। ইফতার পার্টিও দিই। এই আচরণগুলি হামিদ আনসারিদের খুশি করতেই করা হয়। মুখোশটা থাকে ধর্মনিরপেক্ষতার।

অতএব হামিদ আনসারি যে মানসিকতায় এই কথাগুলি বলেছেন, সেই মানসিকতাকে নিন্দা করা এক ধরনের দ্বিচারিতা। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আর যাই হোক তা তুষ্টিকরণ নয়। কিন্তু ভারতের সরকারি ধর্মনিরপেক্ষতা তুষ্টিকরণেরই নামান্তর। খুব দোষণীয় না মনে করেন যদি তবে বলি, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিত্বের পদ বিতরণেও আমরা সেই ধর্মনিরপেক্ষতাই করি যা আসলে তুষ্টিকরণ যা আমরা মোহানদাস করমচাঁদ গান্ধীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

আমি হামিদ আনসারি সাহেবের উক্তিতে খুশি। কারণ, তিনি কোদালকে কোদাল বলেছেন। ভণ্ডামি করেননি।

কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মানসিকতা আমি সমর্থন করলেও বক্তব্যের বিষয়বস্তুর অবশ্যই প্রতিবাদ করি। কারণ এটা ইতিহাসগতভাবে অসত্য। মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রের অনুপাত ছিল ১ : ২৮। শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত The History and Culture of the Indian people, vol.X, p-79-85, vol. XI, p- 880-910 পড়তে পারেন।

ভারতের মুসলমানরা যে পশ্চাৎপদ রয়েছে, তার কারণ তাদের নিজেদের মানসিকতার মধ্যেই আছে। যখন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন হল, হিন্দুরা লাফিয়ে পড়ল সেই শিক্ষা গ্রহণে। মুসলমান ধর্মীয় নেতারা যাঁরা সর্বদাই তাঁদের সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা চাইলেন না যে কোরান ও হাদিশের বাইরে মুসলমান ছাত্ররা অন্য কিছু পড়ুক। মুসলমান ছাত্ররা আবদ্ধ থাকল মাদ্রাসা-মক্তবে। ফলে প্রতিযোগিতামূলক কোনো পরীক্ষাতেই তারা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারল না। তাদের সেই ভুল আজও অব্যাহত আছে অনেকাংশে। আর তাদের সেই ভুলের মাশুল গুনতে হচ্ছে অমুসলমান ছাত্রদের সংরক্ষণের বলি হয়ে।

আনসারি সাহেব যখন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলেন, তখন বিস্মিত হতে হয় তাঁর এবিষয়ে ইতিহাস-বিরুদ্ধ বক্তব্য শুনে। এখন যেটা প্রয়োজন, সেটা হল ব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, মানসিকতার পরিবর্তন। হামিদ আনসারি সাহেবের মধ্যযুগীয় অযৌক্তিক মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন এবং তাঁর মাধ্যমে সাধারণভাবে ইসলাম সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয় নাগরিকদের। হামিদ আনসারি সাহেব এখনও মহম্মদ আলির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে চারজন মুসলমান রাষ্ট্রপতি হয়েছেন

১) জাকির হোসেন - ১৯৬৭-'৬৯

২) মুহম্মদ হিদায়েতুল্লা - ১৯৬৯ (অস্থায়ী)

৩) ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ - ১৯৭৪-'৭৭

৪) এ পি জে আবদুল কালাম - ২০০২-২০০৭

সুপ্রিম কোর্টের মুসলমান প্রধান বিচারপতি

১) মুহম্মদ হিদায়েতুল্লা - ১৯৬৮-'৭০

২) এম এইচ বেগ - ১৯৭৭-'৭৮

৩) এ এম আহমদি - ১৯৯৪-'৯৭

৪) আলতামাস কবির - ২০১২-'১৩

* এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টে ১০ জন মুসলমান বিচারপতি হয়েছেন।

* ভারতের এয়ার চিফ মার্শাল হয়েছিলেন ইদ্রিস হাসান লতিফ।

আসতে পারেননি। ১৯৩০ সালে মহম্মদ আলি বলেছিলেন— Islam was not confined to India. I belong to two circles of equal size but which are not concentric. One is India and the other is the Muslim world. We are not nationalists but super nationalist (১৯৩০ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণের অংশ)। এরও আগে যখন তিনি কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২৩) তখন বলেছিলেন, Extra-territorial sympathics are part of the quintessence of Islam।

আনসারি সাহেব তুষ্টিকরণের কোটায় উপরাষ্ট্রপতি হয়েছেন কিনা আমি জানি না। তবে ইতিহাস পড়ে একথা বুঝতে পারি যে তিনি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি হলেও তিনি সৈয়দ আহমেদ, স্যার মহম্মদ ইকবাল এবং মহম্মদ আলির চিন্তাধারার অনুসারী মাত্র।

একটি দেশে কোনো পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর স্থায়ী উন্নয়ন সংরক্ষণের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নয়। উচিতও নয়, যেহেতু আইনের চোখে সকলেই সমান।

উপযুক্ত ব্যবস্থা হল, পশ্চাৎপদদের উন্নতির জন্য ঢালাও শিক্ষার সুযোগ দেওয়া, যাতে তারা উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সংরক্ষণের দুটি ক্ষতিকর দিক হল— (১) যোগ্য ব্যক্তির বঞ্চিত হওয়া, (২) অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে বসিয়ে সাধারণভাবে কাজের গুণগত মান নষ্ট করা। কিন্তু বৃটিশ ভারতে মুসলমান নেতৃবৃন্দের যাবতীয় আন্দোলন হয়েছে সবই মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের আন্দোলন এবং এই সংরক্ষণ আন্দোলন বৃটিশ ভারতে শেষ হয়েছে ভারত ভাগ করে। জনবিনিময় না হওয়ায় যাঁরা পাকিস্তান পেয়েও পাকিস্তানে যেতে পারেননি, ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা সংরক্ষণের আন্দোলন (ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে) করছেন। এই আন্দোলন স্বাস্থ্যবান হচ্ছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের তুষ্টিকরণের রাজনীতির দ্বারা, যা তারা শিখেছেন গুরু গান্ধীজীর কাছে। এর শেষ কোথায় হবে অনুমান করা যায়।

হামিদ আনসারি সাহেবকে প্রশংসা করতে হয় তার অকপটতার জন্য। তিনি মনে রেখেছেন যে, ভারত রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি হলেও তিনি আগে মুসলমান, পরে ভারতীয়। ভণ্ডেরা তাঁর উক্তিকে বেফাঁস মনে করতে পারেন, কিন্তু অসত্য বলতে পারবেন না। ■

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মুসলমান রাজ্যপাল

পশ্চিমবঙ্গ - ১ জন, দু'পর্যায়ে।
উত্তরপ্রদেশ - ৪ জন।
মহারাষ্ট্র - ৪ জন।
হরিয়ানা - ২ জন।
হিমাচল - ৩ জন।
তামিলনাড়ু - ৩ জন।
বিহার - ৫ জন।
ওড়িশা - ৭ জন।
অসম - ৩ জন।
কেরল - ৩ জন।
কর্ণাটক - ১ জন।
অন্ধ্রপ্রদেশ - ১ জন।
গুজরাট - ১ জন।
পাঞ্জাব - ৩ জন।
মধ্যপ্রদেশ - ৩ জন।
রাজস্থান - ১ জন।
মেঘালয় - ১ জন।
মণিপুর - ২ জন।
নাগাল্যাণ্ড - ১ জন।
মিজোরাম - ১ জন।

'মহাভারত ও রামায়ণ সাধারণের ঘরে ঘরে যে স্থান গ্রহণ করেছে, নূতন ভারত যেন সেই মর্মস্থলে অন্যায় হস্তক্ষেপ না করে। সীতা, সাবিত্রীর প্রতি তীব্র অনুরাগই ভারতীয় নারীর মহত্তম শিক্ষা। ভীষ্ম এবং কর্ণের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার সাহায্যে গৃহে স্বামী-পুত্রের দৃঢ় চরিত্রগঠনই ভারতীয় পত্নী এবং মাতার শ্রেষ্ঠ অবদান।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

চিঠিপত্র

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রাজনীতি

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনকে অধ্যয়ন করলে আমরা দেখব যে, ব্যক্তি স্বার্থ অপেক্ষা রাষ্ট্র স্বার্থকে সব সময় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় মহাকাব্যগুলি আমাদের দিক নির্দেশ দেয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে একজন রাজার কী কর্তব্য থাকা উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন— রাজা প্রজাগণকে নিজ সন্তান সম, কখনও কখনও সন্তান অপেক্ষাও উচ্চস্থানে রাখবেন। এই রাষ্ট্রদর্শন ভারতকে বিশ্বমাঝে এক উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন মনীষীর চিন্তা ও দর্শন আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বসংস্কৃতি হিসাবে পরিচিতি করাতে সাহায্য করেছে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ।

সারা পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় এক দেশ অন্য দেশকে কীভাবে আক্রমণ করছে। অন্যের ভূমি যুদ্ধের মাধ্যমে কীভাবে দখল করেছে। তারই উদাহরণ প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। শুধু তাই নয়, জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে পারমাণবিক বোমা। যাকে বলা হয় মানবসভ্যতার এক কলঙ্কিত অধ্যায়। এই পেক্ষাপটে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি করেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

দীর্ঘ এক হাজার বছর সংগ্রামের ফলে আমরা পেলাম কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। যদিও আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি দেশ বিভাজনের মাধ্যমে। যে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল অতি সমৃদ্ধির ইতিহাস। অথচ আজ আমরা কোথায়? সাম্প্রতিককালের রাজনীতিবিদ তথাকথিত সেকুলার পন্থীরা শুধু ক্ষমতা চান রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনীতি এঁদের কাছে মুখ্য নয়। সংখ্যালঘু তোষণের মাধ্যমে তাঁরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান, উগ্রপন্থার প্রতিও তাদের নরম মনোভাব। এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতীয় অখণ্ডতার ক্ষেত্রে ভয়াবহ। এই অবস্থা চলতে থাকলে দ্বিতীয়বার ভারত ভাগ হতে বেশি সময় লাগবে না। তাই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কৃতিকে তুলে ধরা এবং বিনাশকারী শক্তি যাতে আমাদের অখণ্ডতা ও সংহতিকে বিনাশ করতে না পারে তার জন্য সচেতন থাকা।

—**কর্ণদেব সাহা,**
জলপাইগুড়ি।

বর্তমান পরিস্থিতি ও হিন্দু সংগঠন

আমরা প্রত্যেকেই জানি ২০১৫ সাল ভারতের সামাজিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন মূলত আর এস এস-এর প্রচেষ্টায় স্বাধীনভারতে প্রথমবারের জন্য পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃত জাতীয়তাবাদী সরকার। এই ভোটে বিরোধী দলগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ঠিক এর পরেই শুরু হয় হিন্দু সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অপপ্রচার। এই অপপ্রচারের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্যই হিন্দু সংগঠনের গুরুত্ব অনুধাবন দরকার।

প্রথমেই বলি, হিন্দু সংগঠনের কাজ হলো ভারতবর্ষের হিন্দুদের সংগঠিত করা। সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে মানুষকে প্রয়োজনে সংগঠিত হতে হয়। ঠিক একই কারণে আজ হিন্দুদের সংগঠিত হওয়ার সময় এসেছে। কিছু কারণের উল্লেখ করছি :

প্রথমত, ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আঘাত হেনে চলেছে। ভারতবর্ষের মূল যে ধর্ম তা হলো হিন্দুধর্ম। এখানে হিন্দুদের কখনো বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, কখনো সেবার আড়ালে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলেছে এবং এখনও চলছে। যার ফলে খণ্ডিত হয়েছে ভারত। এখনও ভারতকে খণ্ডিত করার চক্রান্ত চলছে। এই পরিস্থিতিতে সংগঠিত হিন্দুরাই পারে সব চক্রান্ত ব্যর্থ করতে।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন বিদেশি শাসনের অধীনে থাকা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস সঠিকভাবে না জানার জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। অন্ধ অনুকরণ ও নিজের সংস্কৃতি ভুলে যাওয়ার ফলেই সমাজে অপরাধ, ধর্ষণ প্রভৃতি আমাদের সমাজকে পঙ্গু করে দিয়েছে। এই অবস্থায় হিন্দু সংগঠনগুলিই পারে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে।

তৃতীয়ত, বাইরের দেশের বিভিন্ন চক্রান্তের শিকার ভারতকে হতে হচ্ছে। চাণক্য নীতির কথার সূত্র ধরেই বলা যায় যে দেশের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে দেশের প্রতি ভালবাসা না জন্মালে সেনাবাহিনীর পক্ষে একাই এইসব চক্রান্ত প্রতিহত করা সম্ভব নয়। আর এই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ যথাযথভাবে ঘটাতে পারে হিন্দু- সংগঠনগুলিই।

হিন্দু সংগঠনগুলি কোনোদিনও বলেনি যে হিন্দুরা ছাড়া আর কেউ এই দেশে থাকতে পারবে না। ১২৫ কোটি ভারতীয় আজও বিভিন্ন কারণে বিভক্ত। এটি খুব বাস্তব কথা যে আজ বিভিন্ন কারণে কেউ হিন্দুধর্ম ছেড়ে চলে গেলেও তাদের পূর্বপুরুষ কোনো না কোনো সময় হিন্দুই ছিল। আমরা সবাই আমাদের বংশ, আমাদের পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা করি। এই কথা মাথায় রেখে ১২৫ কোটি ভারতীয়র মধ্যেই দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই দেশাত্মবোধ আছে। কিছু মানুষ অপপ্রচারে পথভ্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগানোই হিন্দু সংগঠনগুলির কাজ।

—**রাহুল চক্রবর্তী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

ভারতীয় মেয়েরা পাশ্চাত্যমুখী?

‘ভারতীয় মেয়েরা কি পাশ্চাত্যমুখী হচ্ছে?’ চম্পা মণ্ডলের ২৭ জুলাই স্বস্তিকায় প্রকাশিত লেখাটির বিষয়ে আমার অনুভূতি। ভারতীয় মেয়েরা শুধু নয় ছেলেরা,

ছেলে-মেয়ের বাবা-মায়েরাও পাশ্চাত্যমুখী হচ্ছে বলে মনে হয়। কেবলমাত্র কেক কাটা, মোমবাতি জ্বালানো নয়; আরো কিছু যা ভাবায়, বিস্মিত করে। যেভাবে সিনেমা, টিভি-র গুতোয় অত্যাধুনিক হওয়ার নেশা চেপে বসেছে তাতে পাশ্চাত্যমুখী না হয়ে বোধহয় উপায় থাকছে না। সেই ছোট্টবেলা থেকে আদুরে শিশুপুত্র শিশুকন্যাকে জিন্স পরিয়ে বড় হলে ছেলেমেয়েরা লোফার, মস্তানসুলভ, রঙ চটানো, ছেঁড়া, ফাঁসানো জিন্স্ ছাড়া ভদ্র পোশাক পরতে চায় না। শহর, গ্রামের মেয়েরাও তাই। নোংরা জিনস্ পশ্চিমি দেশের কারখানার শ্রমিকরা পরে থাকে। কারণ কঠোর পরিশ্রমের জন্য ও প্যান্ট টেকসই হওয়ার জন্য জিন্স উপযোগী। আমাদের খোকা- খুকিরা বোধ হয় বুঝিয়ে দিতে চায় যে তারা কারখানার পরিশ্রম-নিষ্পেষিত শ্রমিকের চাইতে উন্নত কেউ নয়। আজকাল আবার স্কিন-টাইট, স্কিন কালার লেগিংস্ পরছে যাতে তার পূর্ণ অবয়বটাই দেখা যায়।

যুবতী মেয়েরা ওইসব ঘৃণ্য পোশাক পরে বাবা-মায়ের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বাবা-মা কী করে মেয়ের ওই রুচি নীরবে দেখেন তা বোধগম্য নয়। যেমন পোশাক তেমনি প্রভাব তার মনের উপর পড়ে। রাস্তায় চলতে চলতে স্টেশনে, ট্রেনে, বা রাস্তাঘাটে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ে জুটির যে সব কুরুচিকর দৃশ্য চোখে পড়ে তার ঘেন্না রাখার জায়গা পাওয়া যায় না। জনসমক্ষে নির্লজ্জ সে আচরণ সহ্য করা যেমন যায় না, তেমনি কিছু বলাও যায় না। বিপদ আছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি— ই এম ইউ ট্রেনের দরজার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে তার সহপাঠী ছেলে বন্ধুটি মেয়েটির কাধের উপর দিয়ে গলা ছুঁয়ে তার দুই হাত দেওয়ালে রেখে ঝুঁকে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গল্প করছে উপস্থিত যাত্রীদের সামনেই। এহেন দৃশ্য এখন আকছার ঘটছে। তার উপর রয়েছে তাদের কুরুচিকর কথাবার্তা-মশকরা।

তবে এসবের জন্য প্রচারমাধ্যম ও চলচিত্র অনেকটাই দায়ী। সিনেমায় বা সিরিয়ালে যেভাবে নগ্নতা দেখানো হচ্ছে তাতে মনে হয় দেশের কোনো আইন নেই। এসব তার কুফল। একদশক আগেও নবম শ্রেণীতে উঠলেই মেয়েদের শাড়ি পরে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। এখন বোধ হয় তা নেই। শুধু মাত্র মাধ্যমিক নয়, উচ্চ মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়, এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ও ইউনিফর্ম বাধ্যতামূলক করা উচিত। কেননা স্থান, পোশাক, পরিবেশ একজনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন ধর্মস্থানে গেলে মন শান্ত, ভক্তিভাবাপন্ন হয়, থানায় গেলে সমীহভাবে আসে (যে কারণেই হোক), তেমনি অন্য ক্ষেত্রেও ঘটে।

—**টিমিড পেনস্পিকার,**
কল্যাণী, নদীয়া।

সবই কি ধর্ম?

কয়েকটা বিষয়ে আমি খুবই অস্বস্তি ভোগ করছি। (১) আজকাল এক শ্রেণীর সাংবাদিকদের কল্যাণে লেখা দেখি 'ইসলাম ধর্ম', 'খৃষ্টান ধর্ম।' যেমন সনাতন ধর্ম বলতে যা বোঝায় 'ইসলাম ধর্ম' ও 'খৃষ্টান ধর্ম' বলতে যেন তাই বোঝায়। যেন হিন্দুধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম একই পর্যায়ভুক্ত। হিন্দুদের বিভ্রান্ত করতে এই ভাবে 'ধর্ম' শব্দকে বিকৃত করে হিন্দুদের মগজধোলাই শুরু করেছে একশ্রেণীর সাংবাদিক যাতে হিন্দুরা হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলাম ও খৃষ্টত্বের যে মৌলিক তফাত আছে তা ভুলে গিয়ে মুসলিম বা খৃষ্টান সহজেই হয়ে যায়। এটা ধর্মান্তরকরণীদের যে কৌশল তা বুঝতে হবে। হিন্দুর 'ধর্ম' এবং মুসলমানের 'ইসলাম' এবং খৃষ্টানদের খৃষ্টত্বের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাই নয়, বিরুদ্ধতাই প্রধান। হিন্দুর ধর্মে ধর্মান্তরকরণ নেই। ইসলামে আছে বলপূর্বক মুসলমান করা এবং খৃষ্টানে আছে খৃষ্টান করা। কোরান অনুসারে কাফেরকে যেখানে পাবে বধ করবে, মুসলান হলে ছেড়ে দেবে (৯/৫), 'আরও আছে— হে আমার রব! আপনি কাফেরদের মধ্য থেকে এক গৃহবাসীকেও জমিনে অবশিষ্ট রাখবেন না।' (রহমান অনুদিত কোরান ৭১/২৬)। খৃষ্টত্বের উদ্দেশ্য সমস্ত জাতিকে ব্যাপটাইজ করা। খৃষ্টানদের উদ্দেশ্য হলো অপর সব স্বদেশি ও বিদেশি মত পথ ধ্বংস করে পৃথিবীতে একমাত্র খৃষ্ট প্রতিষ্ঠা করা। ঠিক তেমনি ইসলামেরও চরম উদ্দেশ্য, সকলকে ইসলাম গ্রহণ করাতে হবে। যখন খৃষ্টত্বের উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম বিনাশ করে খৃষ্টত্ব সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা, আর ইসলামের উদ্দেশ্যও হিন্দুর ধর্ম বিনাশ করে কেবল ইসলাম প্রতিষ্ঠা, তখন ইসলামকে কি ধর্ম বলে প্রচার বাঞ্ছনীয়? খৃষ্টত্বকেও কি ধর্ম বলা উচিত? T.P. Hughes এর Dictionary of Islam গ্রন্থে 'ইসলাম ধর্ম' বলে কোনো শব্দযুগল নেই। 'খৃষ্ট ধর্ম' শব্দও নাই। খৃষ্টান রিলিজন শব্দ আছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম শব্দের পরিভাষা 'রিলিজন' হতে পারে না। আমাদের যতদূর মনে হয় ধর্মান্তকরণীদের সাংবাদিকেরাই 'ইসলাম ধর্ম' 'খৃষ্টধর্ম' ব্যাপকভাবে চালু করেছে যাতে হিন্দুদের বিভ্রান্ত করে তাদের সহজে মুসলমান ও খৃষ্টান করা যায়। দুঃখের বিষয় হলো, স্বস্তিকাতেও 'ইসলাম ধর্ম' হিসেবে লেখা হচ্ছে (২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ : ৩৫)।

(২) হিন্দুদের ইসলামের পথে এগোনোর ও হাঁটানোর কাজ এখন খুব দ্রুতই চলছে। হিন্দুরা জানে না ধীরে ধীরে তারা কীভাবে ইসলামায়িত হচ্ছে।

সৌদি আরবের শেখদের মতো দাড়ি রেখেছেন যশস্বী কয়েকজন ব্যক্তি— মন্ত্রী, চিত্রতারকা। তাঁদের অনুকরণ করে লক্ষ লক্ষ হিন্দু দাড়ি রেখে শেখ হচ্ছেন নিজেদেরই অজান্তে। ইসলামায়িতকরণ ঠেকাব কোন্ পথে? এ বিষয়ে গবেষণা কি জরুরি নয়?

—**শ্রীকৃষ্ণকান্ত সরকার,**
দমদম, কলকাতা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

বাগবাজার গোস্বামী বাড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গাপূজা

সপ্তর্ষি ঘোষ

বাংলার বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর মধ্যে প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যের বিচারে অন্যতম উত্তর কলকাতার বাগবাজারের 'গোঁসাই বাড়ির দুর্গাপুজো'। আনুমানিক পাঁচশো বছর আগে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহে তাঁর নিজস্ব বাস ভবনে দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই পুজো খড়দহ থেকে বাগবাজারে (৫৪৮ রবীন্দ্র সরণি) স্থানান্তরিত হয়। শ্রী নিত্যানন্দ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তিনি যে সময় দুর্গাপুজোর সূত্রপাত করেছিলেন, সেই সময় বাংলাদেশে বৈষ্ণব ও শাক্ত এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ ছিল। শ্রী নিত্যানন্দ এই সামাজিক সংকীর্ণতাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটাই তাঁর মহত্ত্ব।

চিৎপুরের বাড়িতে দুর্গাপুজো ঠিক কবে শুরু হয়, সঠিক জানা না গেলেও আনুমানিক তিনশো বছর ধরে গোঁসাই বাড়িতে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বলে জানালেন গোঁসাই বাড়ির বর্তমান কর্তা মোহনচাঁদ গোস্বামী, যিনি নিত্যানন্দের চতুর্দশ উত্তরপুরুষ। বনেদি বাড়িতে আমরা সচরাচর যেরকম দুর্গা প্রতিমা দেখতে অভ্যস্ত, গোঁসাই বাড়ির প্রতিমায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে দুর্গা প্রতিমার চালচিত্র তিনচালা। দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী থাকেন, কিন্তু এদের বাহন থাকে না। অন্যান্য মূর্তি যথারীতি। চালচিত্রে রাম সীতা, কালী এবং রাধাকৃষ্ণের ছবি অঙ্কিত থাকে। অসুরের গায়ের রঙ সবুজ। দেবীর বাহন শ্বেতবর্ণ।

পুজোর পনেরো দিন আগে কৃষ্ণা নবমীতে কল্পারম্ভ শুরু। এদিন বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি থেকে মা চণ্ডীকে এনে ঠাকুরঘরে রেখে পুজো, ভোগ দেওয়া হয়। মহালয়ার পরদিন প্রতিপদে মা চণ্ডীকে ঠাকুর-দালানে নামিয়ে, দেবীর বোধন ও ঘটস্থাপন করা হয়। গোস্বামী বাড়ির পুজোয় বলি প্রথা নেই। বলির মন্ত্র পাঠ করে মাষকলাই নিবেদন করা হয়। নিত্যানন্দ প্রবর্তিত এই দুর্গাপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কলাবউ। কলাবউয়ের মাথায় সিঁদুর কিন্তু পরনে থান। এর ব্যাখ্যা হলো, পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ হরিনাম বিতরণ করার সময় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরোতেন। মহাসপ্তমীর দিন সকালে ভিক্ষে হিসেবে পেয়েছিলেন একটা সাদা থান। তাতেই তিনি খুশি হন এবং সেই থান কাপড়ই কলাবউকে পরানো হয়। তদবধি নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীদের নবপত্রিকা মাথায় সিঁদুর দিয়ে থান পরেন।

নিত্যানন্দ লোকাচারের উপর নিষ্ঠা ও ভক্তিকে স্থান দিতেন। বর্তমান প্রজন্মও সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আয়োজন করে চলেছেন।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জন্মাষ্টমী উৎসব শ্রীকৃষ্ণ এক আন্তর্জাতিক প্রবাদ পুরুষ

শুভদীপ পাল

কয়েকশো ভক্ত একসঙ্গে খোল-করতাল সহযোগে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গাইতে গাইতে পদযাত্রায় চলেছে। ভাববেন এমন চিত্র আর নতুন কী, এ তো হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা তখনই দেখার মতো বিষয়ে দাঁড়ায় যখন ভারতের বাইরে অন্য কোনো দেশের মানুষ আমাদের পূজ্য যুগাবতারকে নিয়ে এভাবে মেতে ওঠেন।

ইজরায়েল এমনই একটা দেশ। এই দেশের হাইফা নামে একটি জেলায় হরিশ নগরের কাছে কিব্বুৎজ বার্কি শহর। শহরের বাসিন্দা ইহুদিরা মূলত চাষবাস করে জীবিকা চালান। কিন্তু যেটা এখানকার বিশেষত্ব, তা হলো এই শহরের লোকেরা দেশের অন্যান্য অংশের কাছে 'হরে কৃষ্ণ' নামে পরিচিত, কারণ এঁরা আন্তরিকভাবে কৃষ্ণভক্ত। প্রতি বছর এঁরা পরিবারসহ মায়াপুর, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে ভ্রমণে আসেন, এখানকার ধর্মীয় রীতিনীতি নিজের দেশে নিয়ে যান।

আর জন্মাষ্টমী মানে তো এখানে উৎসব। দু'তিনদিন ধরে চলে এই উৎসব। ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও যৌবনের বিভিন্ন লীলা অভিনয়ের দ্বারা মঞ্চস্থ করেন, পাশাপাশি চলে তবলা-ঢোলক-হারমোনিয়াম-বাঁশি-ঝাল্ল-খঞ্জনি সহযোগে নাচগান। বিশাল মানবস্তম্ভ বানিয়ে গোপালের মাখনের হাঁড়ি (দহিহান্ডি) ভাঙাও হয়। ইজরায়েলের অন্যান্য শহর থেকেও প্রচুর দর্শনার্থী এই অনুষ্ঠান দেখতে জমা হন কিব্বুৎজ বার্কিতে। আর সেই বিশাল দর্শনার্থীদের জন্য নানা ব্যবস্থা থাকে। ১০৮ ধরনের নিরামিষ প্রসাদের আয়োজন করা হয়, যার নাম 'কৃষ্ণ প্রসাদম্'। সনাতনী কৃষ্ণপ্রেমের বাণী ধীরে ধীরে গোটা দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছেন কিব্বুৎজ বার্কির ইহুদি কৃষ্ণভক্তগণ। ফলে প্রতিবার আগের বছরের থেকে বেশি ভিড় হয়ে থাকে।

শুধু ইজরায়েলেই নয়, অন্যান্য দেশেও শ্রীকৃষ্ণ সমান জনপ্রিয়। আমাদের দেশের ইসকনের মন্দিরগুলিতে যার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। আমেরিকার বড় বড় শহর যেমন ক্যালিফোর্নিয়া, ওরল্যান্ডো, ম্যাসাচুসেটস্, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে বসবাসকারী হিন্দু ও অহিন্দু কৃষ্ণভক্তগণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উপবাসব্রত, জমায়েত, আনন্দফূর্তি ও ভগবানের বন্দনায় সামিল হন। উৎসব শুরু হয় ভোরবেলা থেকেই। বিভিন্ন মন্দিরে গোপালের মূর্তি দোলনায় রেখে পুজো করা হয়। ভক্তেরা মন্দিরে গিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ, গীতাপাঠ করেন। রাত বারোটায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মক্ষণে শঙ্খধ্বনি দিয়ে ভক্তেরা উপবাস ভাঙেন। কানাডার টরেন্টো, মন্ট্রিল প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলিতেও একইভাবে জন্মাষ্টমী পালিত হয়।

ফ্রান্সের প্যারিস শহরে প্রায় একমাস আগে থেকে জন্মাষ্টমীর প্রস্তুতি শুরু হয়। দোকান-বাজারহাট বিভিন্ন ধরনের সাজানোর সরঞ্জামে ভরে যায়। মন্দিরগুলিতে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। পুজো শুরু হয় জন্মাষ্টমীর দু'তিনদিন আগে থেকে। আর জন্মাষ্টমীর দিন সন্ধ্যা থেকে শুরু করে পরের দিন সূর্য ওঠা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। ভারত থেকে গঙ্গাজল নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাধাকৃষ্ণকে একত্রে রেখে পুজো করা হয়।

সিঙ্গাপুরের কৃষ্ণভক্ত হিন্দু ও অহিন্দুরা শেরাগুন রোড অঞ্চলে বসবাস করেন, জন্মাষ্টমীর সময় যা 'লিটল ইন্ডিয়া' হিসেবে সেজে ওঠার জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চলে প্রচুর মন্দির রয়েছে যেখানে ভক্তেরা রীতিমতো আড়ম্বরের সঙ্গে জন্মাষ্টমী পালন করেন। চান্দের রোডের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে ধুমধাম সহকারে অনুষ্ঠান চলে।

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালা-লামপুরে কয়েক লক্ষ ভারতীয় ও অভারতীয় কৃষ্ণভক্ত জন্মাষ্টমীতে মেতে ওঠেন। মূলত ইসকন পরিচালিত শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের উদ্যোগে অনুষ্ঠানসমূহ পালিত হয়। সারাদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ সেই মহোৎসবের সাক্ষী হতে ভিড় জমান।

নিউজিল্যান্ডে মূলত রাতের বেলায় মূল অনুষ্ঠানটি শুরু হয় এবং এর প্রধান উদ্যোক্তা ওই দেশের দু'টি প্রসিদ্ধ মন্দির—অকল্যান্ডের ইসকন পরিচালিত শ্রীশ্রী রাধা-গিরিধারী মন্দির ও বৈষ্ণবদের দ্বারা পরিচালিত স্বামীনারায়ণ মন্দির। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করা হয়। ভিড়ও হয় দেখার মতো।

হবে নাই বা কেন? শ্রীকৃষ্ণ তো শুধু ভারতের নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের ভগবান—ইন্টারন্যাশানাল প্রবাদপুরুষ।

শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী যুগের নতুন ধারার মন্দির

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

আজুড়িয়া

ড. প্রণব রায়

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত আজুড়িয়া গ্রামটি পাঁশকুড়া-ঘাটাল পাকা রাস্তার 'গঙ্গামাড়োতলা' বাস রাস্তা থেকে পূর্বদিকে কাঁচা রাস্তায় প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গঙ্গামাড়োতলা থেকে পলাশপাই খালের উত্তর তীরবর্তী যে ধারাটি পূর্বদিক বরাবর নিয়েছে (এটি 'চেতুয়া সার্কিট' নামেও পরিচিত), গ্রামটি তারই পার্শ্ববর্তী। ঘাটাল মহকুমা শহর এখান থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার।

এক সময় বহু শিল্পী পরিবার এখানে বাস করায় এই গ্রাম খুবই সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকটি মন্দির-দেবালয় সেই সমৃদ্ধির কালে এখানে তৈরি হয়।

এগুলির মধ্যে গ্রামের পূর্বপাড়ায় ('চরণপাড়া'য়) চরণদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'টেরাকোটা' মন্দিরটি দর্শনীয় পুরাকীর্তি। এটি প্রচলিত 'নবরত্ন'-শৈলীর। পূর্বমুখী এই মন্দিরের সামনে পোড়ামাটির ফলকে লিপি : 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদনানন্দ / জীউ শ্রীচরণ ভরসা। সকাব্দা ১৭৯৩ স/ক সন ১২৭৮ সাল'। অতএব জানা যাচ্ছে, মন্দিরটি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। চরণ-পরিবারের জনৈক ভজহরি চরণ মন্দির প্রতিষ্ঠাতা বলে জানা যায়।

মন্দিরপ্রবেশ পথের ওপরের তিন প্রস্থে প্রচুর 'টেরাকোটা' বর্তমান লেখকের পরিক্রমার সময় দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। সে সময় এগুলি অক্ষত থাকলেও শিল্পশৈলী উচ্চমানের ছিল না, তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। বিষয় : শ্রীকৃষ্ণলীলা— যেমন গোপীদের বস্ত্রহরণদৃশ্য, একটি বৃহৎ রাসমণ্ডলচক্র। রামলীলাদৃশ্যের মধ্যে রামরাবণের যুদ্ধ, পুতনাবধ ইত্যাদি। টেরাকোটা ফলকে 'চণ্ডীমঙ্গলে'র সদাগর উপাখ্যানের 'কমলে কামিনী' দৃশ্যটি সুন্দর। এছাড়া আরো বহু কাহিনি দৃশ্য আছে। গর্ভগৃহপ্রবেশ পথের দু-পাশে অর্ধোন্মুক্ত ভিনিসীয় দরজায় ঘাগরাপরা ও মলপরিহিতা পোড়ামাটির দুটি নারীমূর্তি বৃহৎ। একটির হাতে চামর ও অপরটির হাতে শঙ্খ। দ্বিতলের কক্ষেও ত্রিখিলান প্রবেশপথ আছে। খিলানের ওপরের তিন প্রস্থে চুনকালির ফুলের নক্‌শা। দ্বিতল কক্ষের উত্তরদিকের দেওয়ালে 'স্টাফো'র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি। গর্ভগৃহের ভিতরের ছাদ চারটি খিলানের ওপর ভল্‌টে গঠিত। বিগ্রহবেদির সংলগ্ন দেওয়ালে কালো রঙে পিঙ্কের কাজ আছে।

এই গ্রামের 'সাঁইপাড়া'য় (মনসামাড়ো) মনসার দক্ষিণমুখী ইঁটের 'চারচালা' মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। 'চালা'য় 'ত্রিরথ'-বিন্যাস লক্ষণীয়। ১৩৭৬ সালের (১৯৬৯ খৃ.) সংস্কারকালীন লিপি থেকে জানা যায় ১২৭৭ সালে (১৮৭০ খৃ.) জনৈক সাগর সাঁই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের পার্শ্ববর্তী সূত্র ধর সম্প্রদায়ভুক্ত সাঁই-পরিবারের বাস। সামনে কার্নিশের নিচে একসারি বড়ো বহুড়া' টেরাকোটা মূর্তির মধ্যে দশাবতার, যশোদার দধিমন্থন, গঙ্গা, শিব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

গ্রামের 'মাড়োতলা' এলাকায় ইঁটের তিনটি 'আটচালা' শিবমন্দির আছে। প্রতিষ্ঠাকালীন কোনো লিপি ও কারুকার্য এই মন্দিরে নেই।

'দক্ষিণপাড়া'য় শীতলার পূর্বমুখী সপ্তরথ' রেখ দেউলটি ইঁটের তৈরি। ভগ্নপ্রায় ও পরিত্যক্ত। তলভাগ বা মেঝে গোলাকার কিন্তু ছয়কোণা, অলিন্দের মেঝে গোলাকার ও আটকোণা। মন্দির শীর্ষের বৃহৎ 'আমলক'টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামনের দেওয়ালে কয়েকটি টেরাকোটার মধ্যে দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ, যশোদার দধিমন্থন ইত্যাদি ফলক উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় অল্প হলেও এগুলি নিম্নমানের নয়। প্রতিষ্ঠাকালীন লিপি যদিও এখন নেই, তবুও মন্দিরটি ১৭৪৮ শকাব্দ বা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।

আজুড়িয়া গ্রামটি সেসময়ে খুব সমৃদ্ধ ছিল এসব কারণে।

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

ইতিহাসের গল্প

নবাঙ্কুর

ভয়ে ভক্তি

নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের খুব নাম ডাক। রূপে গুণে সবাই তার ভক্ত হয়ে গেছে। চারিদিকে কৃষ্ণনাম। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মুচি সবাইকে এই মন্ত্র দিয়েছে নিমাই। আর তাতেই মাতোয়ারা হয়েছে নবদ্বীপের মানুষ। সকাল সন্ধ্যা সবাই হরিনাম করছে। ধীরে ধীরে নিমাই পণ্ডিতের নাম নবদ্বীপের আশেপাশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দলে দলে মানুষ তার ভক্ত হতে শুরু করে। তখন মুসলমান শাসন। তাদের অত্যাচারের সীমা নেই। মুসলমান সেনারা জোর করে হিন্দুঘরের মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে সম্মান নষ্ট করে। ব্রাহ্মণদের জোর করে গো-মাংস খাইয়ে দেয়। ধর্ম নষ্ট করে।

নবদ্বীপের কাজি, সে মহা বজ্জাত। হিন্দুদের কৃষ্ণনাম তার একদম পছন্দ নয়। কাজির কাছে খবর গেল, নিমাই নামে এক পণ্ডিত নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় কৃষ্ণনাম করে বেড়াচ্ছে আর লোক খেপাচ্ছে। দলে দলে লোক তার সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচছে। খোল, করতাল বাজাচ্ছে আর বলছে হরিবোল, হরিবোল। এই খবর শুনে কাজি চটে লাল। এতবড় সাহস, তার শাসনে কৃষ্ণনাম! সে সেপাই বরকন্দাজ ডেকে বলল— আজ থেকে নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম বন্ধ। সেপাইরা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সব জায়গায় তা বলে বেড়াল— যে কৃষ্ণনাম করবে তাকে চাবুক মারা হবে। নবদ্বীপের মানুষ এই শুনে খুব ভয় পেয়ে গেল। এই কথা নিমাইয়ের কানে গিয়ে পৌঁছল। নিতাই, হরিদাস, শ্রীবাস, মুরারী সব সঙ্গী-সাথীরা বলল— এখন কী হবে? নিমাই কিন্তু ভয় পেল না। কৃষ্ণনাম চালিয়ে গেল।

হুকুম জারি করে কাজির তো মহাআনন্দ। দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে বসে বসে। এদিকে নিমাই কিন্তু বসে নেই। কাজির অত্যাচার আর কতদিন সহ্য করা যায়। তার চিন্তা কিছু একটা করতে হবে। অনেক ভেবে নিমাই ঠিক করল যে তারা সবাই মিলে নগর সংকীর্তন বের করবে। আর সেই সংকীর্তনের দল কাজির বাড়ি যাবে। নিমাই এই কথা বলতেই চারিদিকে তা চাউর হয়ে গেল। সবার মনে সাহস এলো। কাজির উপর যাদের বেশি রাগ তারা ভাবলো এই সুযোগে কাজিকে দু' ঘা

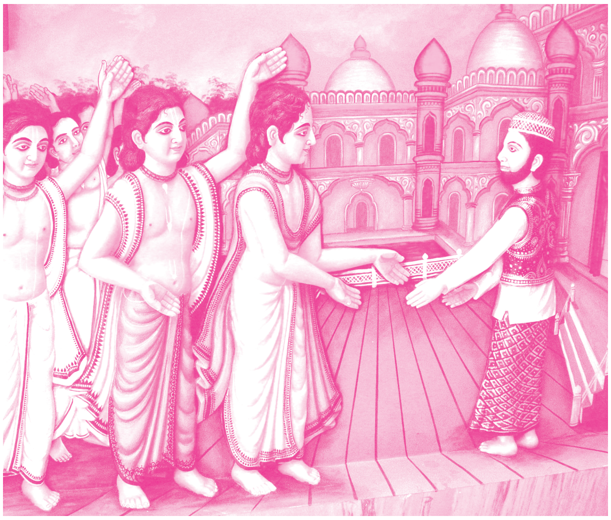

বসিয়ে দেবে। নিমাই কিন্তু কাজির কোনো ক্ষতি হতে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়।

নগর সংকীর্তনের দিন চলে এলো। সব বন্দোবস্ত পাকা। সেদিন বিকেলবেলা গঙ্গার ঘাটে সংকীর্তন শুরু হলো। শত শত লোক সেখানে হাজির হয়েছে। নবদ্বীপ তো বটেই বাইরে থেকেও বহু লোক এসেছে। খোল, করতাল, শিঙ্গা বাজাতে বাজাতে সংকীর্তনের দল এগিয়ে চলল। হরিবোল বলছে আর সবাই নাচছে। বৃদ্ধ যুবক সবাই এতে অংশ নিয়েছে। লোকসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সব বাড়ির সামনে মঙ্গলঘট রাখা হয়েছে, বাড়ির মায়েরা ফুল, খই ছড়াচ্ছে। সংকীর্তনের দল ক্রমে জনসমুদ্রের রূপ নিল। তারা ধীরে ধীরে কাজির বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই দেখে কাজির গুপ্তচর আর সেপাইদের তো চক্ষু চড়কগাছ। তারা কাজিকে গিয়ে খবর দিল— নিমাই পণ্ডিত তার দলবল নিয়ে কাজির বাড়ি আক্রমণ করতে আসছে। কাজি বলল— কত লোক? সেপাই বলল— সে তো হাজার হাজার। কাজির গলা শুকিয়ে গেল। চোদ্দ-কুড়িজন সেপাই বরকন্দাজ দিয়ে এতো লোক কী করে সামলাবে। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, নিমাইরা একে একে মশাল জ্বালাতে লাগলো। শত শত মশাল জ্বলে উঠল। সেই সঙ্গে হরিবোল হরিবোল হুঙ্কার। এই দেখে কাজির সেপাইরা সব 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে পালিয়ে গেল। কাজি এখন কী করে! ভয়ে কাঁপছে, পালাবারও পথ নেই।

সংকীর্তনের দল কাজির বাড়ির সামনে এসে থামলো। নিমাই আর তার কয়েকজন সঙ্গী এগিয়ে এলো। দরজায় কড়া নেড়ে ডাকল— কাজি মশায় বাড়িতে আছেন? কাজির তখন থরহরি কম্প অবস্থা। কী করে! বাধ্য হয়ে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে নিমাইকে দেখেই কাজি একগাল হেসে বলল—ভাগ্নে যে! এসো এসো। নিমাইও তখন বাঁকা হাসি হেসে কাজিকে মামা বলে সম্বোধন করলো।

তারপর থেকে নবদ্বীপে কাজি আর কোনোদিন কৃষ্ণনামের বিরোধিতা করেনি।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

বিহার

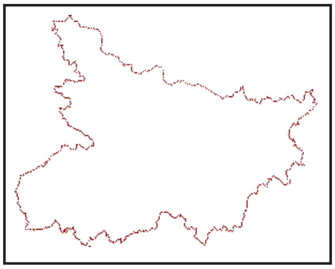

পূর্বতন মগধ রাজ্য বর্তমানে বিহার। মৌর্যবংশের রাজারা এখানে দীর্ঘকাল শাসন করেছে। তাদের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। বর্তমান বিহার রাজ্যের পত্তন হয় ১৯৩৬ সালে। পরবর্তীতে ঝাড়খণ্ড বিহার থেকে আলাদা হয়ে যায়। বিহারের বর্তমান রাজধানী পাটনা। সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিহার বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান ছিল। তৎকালীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। এই রাজ্যেই ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। বিহারের দ্বারভাঙ্গা ও মধুবনী জেলার 'মিথিলা' চিত্রশৈলী ভারতের অন্যতম চিত্রশৈলী। স্বাধীনতা আন্দোলনেও এই রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। বিহারের মোট আয়তন ৯৪ হাজার ১৬৩ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪ হাজার ৬৩৭ জন। বিহার ভারতের তৃতীয় জনবহুল রাজ্য।

লিখে পাঠাও

দেবী দুর্গা আসছেন, সঙ্গে আসছে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। সবাইকে নিয়ে কেমন এই **দেবীর সংসার**। ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাতে হবে আমাদের ঠিকানায়। সেরা লেখাটি প্রকাশিত হবে নবাঙ্কুরের পাতায়।

দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পাঠানো যাবে।

ছবিতে অমিল খোঁজ

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ণ ক্ষ ল শী

(২) কে ব র টু

৩১ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) গঙ্গাসাগর (২) কর্ণসুবর্ণ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) পু স ন মা ত্র

(২) লি চো বা র খে

৩১ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) হিতোপদেশ (২) হিমসাগর

উত্তরদাতার নাম

(১) রিনিশা রায়, মুন্সিরহাট, হাওড়া।
(২) সুমন কর্মকার, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
(৩) অনুষ্কা ঘোষ, কল্যাণী, নদীয়া।
(৪) অরূপ দাস, গঙ্গাসাগর, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

অঙ্গনা

সবসময় শেষরক্ষা হয় কি?

সুতপা বসাক ভড়

ছোটবেলা থেকে দেখা যায় মেয়েরা কেবলমাত্র লক্ষ্মীমন্ত নয়, সরস্বতীমন্তও বটে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে পড়াশুনা করার প্রবণতা বেশি। উঁচু ক্লাশে ওঠার সঙ্গে মেয়েরা ছেলেদের থেকে পড়াশুনায় বেশি সময় ও মন দেয়। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে মেয়েরা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাজও করে থাকে। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একাগ্রতা ও পরিশ্রমের জন্য এদের সাফল্য মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তরে আশাতীত হয়। ২০১৪ সালে সি.বি.এস.ই-র উচ্চমাধ্যমিকে ৭৮.২৭ শতাংশ ছেলে এবং ৮৮.৫২ শতাংশ মেয়ে পাশ করে, অথচ পড়াশুনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সংখ্যা এবং তাদের সাফল্যের সংখ্যা কমতে থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, মেয়েরা এত ভালভাবে পড়াশুনা করা সত্ত্বেও কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মজীবনে সাফল্য পায় না? কেনই বা তারা বেশিরভাগই হঠাৎ করে উচ্চতর শিক্ষাজগৎ থেকে হারিয়ে যায়?

সাধারণ ঘরের অভিভাবকরা ভাবেন মেয়েরা কলাবিভাগ নিয়ে পড়াশুনা করবে। বিজ্ঞানে মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণে তাঁরা অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে থাকেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, গৃহবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় কষ্ট করে মেনে নিলেও ভৌতিক বিজ্ঞান, রসায়ণ, গণিতে মেয়েদের পারদর্শিতায় তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি। সেজন্য ছেলে যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়— ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েরা ডাক্তারি করবে। ডাক্তার না হলে নার্স— তাও নাহলে শিক্ষিকা ব্যাস্। কয়েকবছর আগে পর্যন্ত অভিভাবকেরা এর বেশি ভাবনা চিন্তাও করতে পারতেন না।

পুলিশের চাকরিতে দেখুন। কতজন মহিলা পাবেন? সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার দিল্লী-সহ দেশের কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলিতে পুলিশের চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণকে মঞ্জুরি দিয়েছে। গত বছর ভারতীয় পুলিশে মহিলাদের সংখ্যা একলক্ষ অতিক্রম করে। তা সত্ত্বেও ভারতীয় পুলিশে মহিলাদের সংখ্যা মাত্র ৬.১ শতাংশ, অথচ দেশের মহিলার সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ। এইরকম সব চাকরিতেই মেয়েদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দেবার ব্যাপারে আলোচনা চলছে।

বেশিরভাগ অভিভাবকের ইচ্ছা মেয়েরা বি.এ., এম.এ. পাশ করে যা হোক একটা চাকরি জুটিয়ে নেবে। নিজের খরচ নিজেই খানিকটা চালিয়ে নেবে। এর থেকে বেশি অনেক অভিভাবকই ভাবতে পারেন না। বিয়ের বাজারে 'কর্মরতা পাত্রী' অগ্রগণ্যা, অথচ 'গৃহকর্মে নিপুণা', 'সুন্দরী'...ইত্যাদিও পাত্রপক্ষের কাম্য। আবার বিয়ের সময় স্বামীর থেকে স্ত্রী বড় চাকরি করে এটা মেনে নেওয়াও পাত্রপক্ষের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। আসলে মেয়েরা অনেক সময় থমকে দাঁড়ায়, কারণ বেশিরভাগ পুরুষ তাদের নিজেদের সমকক্ষ ভাবতে পারে না। নাহলে মাত্র ২০ শতাংশ অভিভাবকই বা কেন মেয়েদের ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি তৈরি করতে আগ্রহী হন? মেয়েদের ঠিকঠাক পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা দিলে তারা ঠিক এগিয়ে যাবে।

আসলে বর্তমানে আমাদের সমাজব্যবস্থা একদিকে মেয়েদের আত্মনির্ভর বানাতে যাও বা চায়, অপরদিকে সংসারে মেয়েদের কাজে কমবেশি মেনে নিতে পারে না। সেজন্য অনেকক্ষেত্রেই সংসারের শান্তি বজায় রাখতে কেরিয়ারের বলিদান মেয়েরাই দেয়।

আমাদের চারদিকে দেখা যায়, বিয়ের পরে বউটি দিনের শেষে চাকরি করে ঘরে ঢুকেই সংসারের কাজে লেগে পড়ে। স্বামী হয়ত ক্লান্ত হয়ে টেলিভিশন দেখছে বা খবরের কাগজ পড়ছে বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেল। বউটি কিন্তু সংসার সামলে, বাচ্চাদের পড়াশুনা দেখিয়ে দেয়। সে কী ক্লান্ত হয় না? কাজের মাসি না এলে তার কাজটাও বউটিকেই করতে হয়। শারীরিকভাবে ভেঙে পড়লেও অনেক সময় পরিবারের সমর্থন পায় না। তখন তার কষ্ট অসহনীয় হয়ে ওঠে। তার পরিশ্রমের মূল্যায়ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় না।

সামাজিকভাবে চাকরি করা বউয়ের প্রতিষ্ঠা বেশি। বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি এমন প্রতিষ্ঠিত মেয়ে-বউকেই চায়। সেজন্য বউটি কষ্ট হলেও যতক্ষণ পারে সবদিক সামলে চলার চেষ্টা করে। অনেকসময় ক্লান্ত হয়ে যখন আর পারে না, তখন চাকরি ছেড়ে দেয়। পরিবারের জন্য তার এই ত্যাগ। পরিবার কি সবসময় এর মূল্য দেয়?

আশার কথা, সমাজে পরিবর্তন আসছে। অনেক পরিবারে মেয়েদের পড়াশুনা, এগিয়ে যাবার কাজে উৎসাহ দেয়, সাহায্য করে; তবে সংখ্যায় কম। পুত্র-কন্যার সমান মূল্যায়ন না হলে পুরো সমাজে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন আসা সময়সাপেক্ষ। সবাইকেই মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। যা হয়ে গেছে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন প্রজন্মকে আমরা সর্বতো সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই। দেশের অর্ধেক শক্তি মেয়েরা কিন্তু বাকি অর্ধেকের নিয়ন্ত্রণও বাস্তবে তাদেরই হাতে। ■

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

ধর্মীয় গোঁড়ামির সমার্থক ঔরঙ্গজেবের নাম আধুনিক ভারতের পথ-ফলক হিসেবে শোভন নয়

উত্তর ও মধ্যভারতের কোনো স্থানীয় পুরসভা যদি সেখানকার 'ঘণ্টাঘর চক'-এর নাম বদলে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের নামাঙ্কিত করত, সেক্ষেত্রে জাতীয় সংবাদমাধ্যমগুলিতে এত কালি বা বাইট খরচা হোত না। প্রকৃতপক্ষে উত্তর-উপনিবেশিক ভারতে রাস্তা-ঘাটগুলি বিশেষ করে যাদের সঙ্গে একটু অতীত শাসকদের ছোঁয়া আছে সেগুলির নাম পালটাতে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা থাকলেই সুযোগ ছাড়ে না। যেমন, ইংরেজ জমানার রানির নাম বহনকারী মুম্বই-এর Victoria Terminus এখন ছত্রপতি শিবাজী স্টেশন নামে সুবিদিত, কলকাতার ইতিহাস প্রসিদ্ধ ডালহৌসি স্কোয়ার বহুদিন শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশের স্মৃতি বহন করছে। অন্যদিকে তৎকালীন মাদ্রাজের St. Thomas Mount Road আজকের চেন্নাই-এর 'আন্না সালাই' অর্থে আন্না রাজপথ। এই নাম পালটানো অনেক সময় আপাত অজান্তে অসাধারণ ঐতিহাসিক পরিহাসের জন্ম দেয়। যেমন কলকাতার মার্কিন দূতাবাসটি যে হ্যারিংটন স্ট্রিটে অবস্থিত তা এখন ভিয়েতনামের নায়ক হো চি মিনের নামাঙ্কিত। এই ভিয়েতনামের সঙ্গেই আমেরিকা দশ বছরের বেশি সময় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

এই নাম বদলানোর হিড়িক শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ভাবলে ভুল হবে। ইউরোপেও কিছুটা বৃটেন ছাড়া বাকি দেশগুলি অনবরতভাবে তাদের রাস্তা ঘাট, সৌধের নাম পরিবর্তনের খেলায় মগ্ন আছে। যেমন, মার্ক্স, লেনিন, স্টালিন বা তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত এমন অনেকেরই নামাঙ্কিত পথ বা সৌধের পরিচয় মুছে দিয়ে তাদের আবার সাম্যবাদ পূর্ববর্তী নাম বা তারও আগেকার অনেক সময় fascist জমানার নাম পুনরুদ্ধার করে নব কলেবরে রাখা হয়েছে। লেনিনগ্রাদ-এর সেন্ট পিটার্সবার্গ হওয়া মনে পড়বে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবলভাবে জার্মানদের হাতে বিধ্বস্ত পোল্যান্ড যা ১৯৪৫ পর্যন্ত ছিল পূর্ব প্রুসিয়া আজ জার্মানদের তিলমাত্র স্মৃতি সেখানে অবশিষ্ট নেই। Konigsberg আজ ক্যালিনিনগ্রাড আর জার্মানির সাধের Danzig আজকের কর্মচঞ্চল Gdansk.

অনেকেই বলে থাকেন চলতি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আগেকার শহর রাস্তা বা সৌধের পুনর্নামাঙ্কন এক অর্থে ইতিহাসে মুছে ফেলারই নামান্তর। ভাগ্যিস ইতিহাস পড়ার সময় Atlas বা রাস্তার নামের ম্যাপ নিয়ে পড়া হয় না। তাই দিল্লির একটি মুখ্য রাজপথ থেকে ঔরঙ্গজেবের নাম উঠে গেলেও ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে ঝট

ঔরঙ্গজেবের কালাপাহাড়ি ভাবমূর্তি পরধর্ম অসহিষ্ণুতা জনমনে এতটাই গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে যে তার ফলেই উভয় ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে প্রবল বিভাজনের জন্ম হয়েছে। তাই তিনি কখনোই ভারতবর্ষের একজন মহান ও সুসন্তান হিসেবে গণ্য হবার মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী নন।

করে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। আর তাই যদি হোত তবে যতই বিতর্কিত হন না কেন আধুনিক ভারতের ইতিহাসের কিছুটা বীজবপনকারী ভূমিকায় থাকা Lord Curzon-এর নামের রাস্তা কস্তুরবা গান্ধী মার্গ হলেও দেশের ইতিহাসের বইগুলিতে কস্তুরবার নামে একটা অধ্যায় ঢুকিয়ে দিলেই কি সঠিক ইতিহাস পাঠ হোত না সত্য সামনে আসত।

তাই দেশের সার্বজনীন স্থানগুলির নামকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও গঠনমূলক চরিত্রগুলির কথা বিবেচনায় রাখা দরকার। ঐতিহাসিকরা যে ধারায় সচরাচর ইতিহাসের বিবরণ দিয়ে থাকেন বাস্তবে তার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি যতটা ভাল বা মন্দ বা কদর্য ছিল তা অনুধাবন করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষের সম্মিলিত চেতনা বা বিচারে অতীতের ব্যক্তিত্বদের নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধের ভিত্তিতেই স্মৃতি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। তাই বিগতদিনের মহান মানব-মানবীদের স্মরণে সকলের নজরে পড়ে এমন স্থানেই তাঁদের স্মারক নির্মিত হয়। এঁদের থেকে কম গুরুত্বের ইতিহাস-পুরুষেরা জনচেতনায় পুরোপুরি হারিয়ে অবশ্যই যান না, তবে তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষণ সমানভাবে হয় না। এই ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম জার্মানি। আজকের আধুনিক বার্লিনে Adolf Hitler-এর নাম বহনকারী কিছুই নজরে পড়বে না। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বধীন 3rd Reich-এর জামানার ভয়ঙ্কর স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে সেই ধ্বংসলীলার (Holocaust) শিকারিদের স্মরণে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে ২০০৮ সালে এমনি একটি মর্মস্পর্শী স্মরণসভায় আসা জার্মানিতে নিযুক্ত ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূতের পর্যবেক্ষণটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার মনে হয় না পৃথিবীর আরও কোনো দেশ নিজ দেশের কু-কর্মকে মানুষের স্মৃতিতে চিরজাগরুক রাখতে এমন আশ্চর্য প্রচেষ্টা করে থাকে।’ হ্যাঁ, গরিষ্ঠাংশ দেশই এমন কিছু করে না। তার মানে এই নয় যে তাদের এসব মনে নেই। আসলে তার চায় না প্রতি নিয়ত কেউ তাদের কু-কীর্তির কথা স্মরণ করাক।

অবশ্য বারাণসীবাসীরা একথাটা না মানতেও পারেন। কেননা সেখানকার প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দিরের দেওয়ালের সঙ্গে একাত্ম হয়েই মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তৈরি মন্দির সহাবস্থান করছে। এটা সকলেই জানেন তিনি হিন্দুদের প্রতি বিজাতীয় ধর্মীয় উন্মাদনা থেকেই জোর করে বিশ্বনাথ মন্দিরের দখল নিয়ে তৈরি করেছিলেন মসজিদ। আদৌ কোনো ধর্মপ্রাণ উদার মুসলমান হিসেবে নয়।

তথাকথিত প্রগতিবাদী কিছু ঐতিহাসিক যেভাবেই হোক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করুক না কেন সাধারণ ভারতীয়দের স্মৃতিতে ঔরঙ্গজেবের ঐতিহাসিক পরিচয় অত্যন্ত ঘৃণাভরে উচ্চারিত হয়। গড়পড়তা ভারতীয়ের কাছে ঔরঙ্গজেব বরাবরই গজনির সুলতান মামুদ নামে যে লুটেরা ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিল তারই পদাঙ্ক অনুসরণকারী হিসেবে চিহ্নিত। কারণ মামুদ দেশের মন্দির ও পবিত্র স্থানগুলিই বেছে বেছে ধ্বংস করেছিল। ঔরঙ্গজেবও ঠিক তাই করেছিলেন। এই ধরনের বিশ্লেষণ হয়তো শেষ মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের নানা জটিলতা উপেক্ষা করে করা হচ্ছে এমনটা কেউ কেউ তর্ক করে বলতে পারেন, তবে ইতিহাসটা সত্য।

বাস্তবে ঔরঙ্গজেবের কালাপাহাড়ি ভাবমূর্তি পরধর্ম অসহিষ্ণুতা জনমনে এতটাই গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে যে তার ফলেই উভয় ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে প্রবল বিভাজনের জন্ম হয়েছে। তাই তিনি কখনোই ভারতবর্ষের একজন মহান ও সুসন্তান হিসেবে গণ্য হবার মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী নন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মূল সমস্যাটি মাথা চাড়া দেয়। এমন এক ঔরঙ্গজেবের নামাঙ্কিত রাস্তাটি অবস্থান করছে একেবারে রাজধানী দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে। দিল্লির ইতিহাস নিশ্চয় কয়েক শতাব্দী প্রাচীনতার দাবি করতে পারে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র হিসেবে যে অঞ্চলটি বোঝায় সেটি মন্ত্রী, সাংসদদের আবাসস্থল Lutyens দিল্লি। তাই এই চৌহদ্দির মধ্যের সবকিছুই স্বাধীন ভারতের সাফল্য প্রাণচাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াই কাম্য ও মানানসই। এখানে প্রতিফলিত হওয়া উচিত স্বাধীন ভারতের গৌরবগাথা বা তার কৃতী মানুষদের কর্মকাণ্ডের স্মারক।

কখনই সুলতানি বা মুঘল আমলের স্মৃতি নয়। সেই মানদণ্ডে সুদূর সাগর-শহর রামেশ্বরমের এই গরিব সন্তান যিনি আপন প্রতিভার উজ্জ্বল বিকিরণে সারা ভারতের কয়েকটি প্রজন্মকে উজ্জীবিত করে গেছেন, আজকের দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে জায়গা পাওয়ার প্রথম অধিকার তাঁর স্মৃতির, কখনই এক ধর্মোন্মাদ অত্যাচারী সম্রাটের নয়। তাই অতীত ইতিহসের পাতায় ঔরঙ্গজেব তার জায়গায় আছে, আজকের গৌরবময় স্বাধীন ভারতের রাজপথে নয়। ■

কোটিপতি হোন!

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন

১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090
9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

বাঘা যতীনের শহীদ-শতবর্ষে কূটনৈতিক সাফল্যের পরিকল্পনা কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বালেশ্বরের যুদ্ধে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন শেষ মুহূর্তে কাতর কণ্ঠে তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন : ''তোরা রইলি। ওরে, তোরা মরবার আগে দেশবাসীকে মুক্তকণ্ঠে বলে যাস— আমরা ডাকাত নই! দেশবাসীকে জানিয়ে যাস আমাদের মহান ব্রতের কথা। নতুন যুগের কর্মীরা এই দৃষ্টান্ত থেকেই খুঁজে পাবে তাদের পাথেয় : দেশ জাগবে, এগিয়ে যাবে আমাদেরই পথে।'' বাঘাযতীন দেখে যেতে পারলে সুখী হতেন যে আজ শতবর্ষ পেরিয়ে দেশবাসী তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। একদিন ডাকাত ধরিয়ে দেবার উন্মাদনায় দেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, স্বাধীনতার বহু বছর পরেও তা সংশোধনের চেষ্টা করা হয়নি। তাই বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী-র মতো মহান বিপ্লবীরা এন সি ই আর টি অনুমোদিত স্কুলপাঠ্যে বইতে 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবেই আখ্যায়িত হন। বাঘা যতীনের শহীদ শতবর্ষে এবার সেই ইতিহাস-ই বদলাতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পর্বের বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে গবেষণা গোষ্ঠী গঠিত হবে। এবং এই পর্বের বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ওপর গবেষণা পৃথক গুরুত্ব দিয়ে হবে।

বাঘা যতীনকে কেন আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? সংশ্লিষ্ট গবেষকদের বক্তব্য, বিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের যে নতুন অধ্যায় শুরু হলো তার পুরোধা পুরুষ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। এই আন্দোলনকে লঘু করে নরমপন্থী গান্ধীবাদী আন্দোলনকে বড়ো করে দেখানোর প্রয়াস কংগ্রেসীরা সহজবোধ্য কারণেই করেছিলেন। আর এক্ষেত্রে তাঁরা পাশে পেয়ে যান কমিউনিস্টদের। যাঁরা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে শুধু চরম বিশ্বাসঘাতকতাই করেননি, স্বাধীনতার পরও বিপ্লবী আন্দোলনকে অপমানের নানাবিধ প্রয়াস করেছেন এবং এঁদেরই পেটোয়া ইতিহাসবিদেরা ভারতীয়ত্ব-বিরোধী নানা ধ্যান-ধারণা জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেছেন। এই পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি দিতে কোনো রঙিন চশমা না পড়ে ভারতের প্রয়াসেই কেন্দ্রের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে বাঘা যতীন রয়েছেন বলে সূত্রের বক্তব্য।

আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকেও এই প্রয়াস জরুরি। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পরেই দেশের কূটনীতিকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং সুষমা স্বরাজের নেতৃত্বাধীন দেশের বিদেশমন্ত্রক সেই কূটনৈতিক দৌত্যে এখনও অবধি চূড়ান্ত সফল। বাঘা যতীনের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যত্যয় হয়নি। বাঘা যতীনের জন্ম কুষ্ঠিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়াগ্রামের মাতুলালয়ে। কুষ্ঠিয়া কিংবা পার্শ্ববর্তী শিলাইদহের মতোই কুমারখালীও ছিল এক সময়ে বাংলার সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর। এই অঞ্চলের সঙ্গে যেমন বাঘা যতীনের মামারবাড়ি চট্টোপাধ্যায় বংশের নাম জড়িয়ে রয়েছে, তেমনি লালন ফকির ও কাঙাল হরিনাথের স্মৃতিধন্যও কুমারখালী। কিন্তু এইসব স্মৃতি এখন সেখানে অতীত। ভুললে

ওড়িশার বালেশ্বরে বাঘা যতীনের মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

চলবে না এই কয়াগ্রামেই বাঘ মেরে ‘বাঘা যতীন’ হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু বর্তমানে গ্রামটির দখল জামাত-রাজাকারদের হাতে। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের জমিজিরেতও শত্রু সম্পত্তি আইনে (বর্তমানে সমর্পিত সম্পত্তি আইন) মৌলবাদীদের কবজায়।

বি এন পি-জামাতের আমলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্নেহধন্য কুষ্ঠিয়া চার নম্বর আসনের এম পি মেহের রুমি তার বাবার নামে কলেজের নামকরণ মাসুদ রুমি কলেজ করে দেন। এই মাসুদ রুমির পরিচয় হলো তিনি একজন রাজাকার, খান-সেনাদের সমর্থক ’৭১-এর যুদ্ধপরাধীও বটে। এই পরিস্থিতিতে গত বছর কয়াগ্রামে বাঘা যতীনের ৯৯তম আত্মবলিদান দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন পরিচিত বুদ্ধিজীবী। সেখানেই আওয়াজ উঠেছিল কলেজটির নাম বাঘা যতীনের নামে নামাঙ্কিত করার। কারণ কলেজের আর তার লাগোয়া জমির কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় কলেজ ভবনের জমি তো বটেই, তার পার্শ্ববর্তী বিএনপি-জামাতের দাপট বর্তমান পরিবর্তিত জমানাতেও এতটাই বেশি যে গত এক বছরেও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ আনুষ্ঠানিক ভাবে মাসুদ রুমি কলেজের নাম পরিবর্তিত করে বাঘা যতীন কলেজ করার প্রস্তাব পাঠাতে পারেনি। এবছর শাহরিয়র কবীর, মুনতাসির মামুন, আনিসুজ্জামান-এর মতো বাংলাদেশের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবীরা গত ২ সেপ্টেম্বর কয়াগ্রামে এক বিশাল সভা করে ফের কলেজ ও লাগোয়া সড়কের নাম বাঘা যতীনের নামে করার সংকল্প নিয়েছেন। কলকাতা থেকে এক প্রতিনিধিদল এঁদের হাতে বালেশ্বরের মাটি ও বুড়িবালামের জল (যে অঞ্চলে ও যে নদীর পারে আজ থেকে একশো বছর আগে যতীন্দ্রনাথ আত্মাহুতি দিয়েছিলেন) তুলে দেওয়ায় ভারতও যে এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে এঁদের পাশে রয়েছে তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

ভারতের মতো বাংলাদেশেও বাঘা যতীনের মৃত্যুশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে জাতীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। এঁদের এক প্রতিনিধিদল গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর ওড়িশাতে বাঘা যতীনের শহীদ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কয়াগ্রামের মাটি ও পদ্মানদীর জল তুলে দেন।

৮ তারিখ বালেশ্বরের যে বিশাল সমাবেশে তাঁরা এটা হস্তান্তর করেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। এর পরের দিন স্থানীয় ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত একটি আলোচনা চক্রেও উপস্থিত ছিলেন তাঁরা। তার পরদিন অর্থাৎ ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে ’৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত এক আলোচনা চক্রে কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি শাহরিয়র কবীর মন্তব্য করেন— ‘১৯৭১-এর ঐতিহাসিক সংগ্রামে পাকিস্তানি খান সেনাদের হাতে বাংলাদেশের তিরিশ লক্ষ মানুষ যে শহীদ হয়েছিলেন, সেই প্রেরণার উৎস ছিল বাঘা যতীনের মতো বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গ।’ বলা বাহুল্য, কূটনীতিকরা মনে করছেন বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীবন্ধনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছেন বাঘা যতীন এবং চীন-পাকিস্তানকে রুখতে অন্য প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে নরেন্দ্র মোদী যে গুরুত্ব দিয়েছেন সেইদিক দিয়েও আগামীদিনে শহীদ যতীন্দ্রনাথ খুব তাৎপর্যপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে যাচ্ছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

কলকাতাকেন্দ্রিক সংস্থা ইনস্টিটিউট অব্ সোস্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ কলকাতা ও দিল্লীতে বাঘা যতীনকে নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে বলে সংস্থাটি সূত্রে খবর। পাশাপাশি বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ সমিতিও বলা বাহুল্য এনিয়ে নানা কার্যক্রমের কথা ঘোষণা করেছে। বাঘা যতীনের শহীদ শতবর্ষে তাঁকে নিয়ে যে নানা বেসরকারি প্রয়াস জারি হয়েছে, তার উদ্দেশ্য নেহাত উদ্‌যাপন নয়। দেশের কূটনৈতিক সাফল্যকে আরও এক কদম এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও বটে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮৯০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

একাত্ম মানবদর্শনের বিচারধারায় ভারতের সংবিধান

অমল কান্তি বসু

ভারতের সংবিধান বিশ্বে সবচেয়ে দীর্ঘ, সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বিস্তৃত লিখিত সংবিধান। আমেরিকার সংবিধান সংশোধনীসহ মাত্র ২০ পাতার। চতুর্থ ফরাসি রিপাবলিক (১৯৪৬) মাত্র ২৫ পাতার, ইতালি রিপাবলিক (১৯৪৭) মাত্র ৩৫ পাতার, জার্মানির ফেডারেল রিপাবলিকের সংবিধান (১৯৪৯) মাত্র ৪৫ পাতার। ভারতের মূল সংবিধান ২৫০ পাতার বেশি।

এত লম্বা চওড়া হওয়ার কারণে সংবিধানের স্বরূপ নিয়ে নকশালবাদী নাগি রেড্ডি, কোটেশ্বররাও এমনকী ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং স্বয়ং শ্রী আম্বেদকরও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মাসানি অনেকদূর অগ্রসর হয়ে বলেছিলেন যে, এই সংবিধান 'A scheme which is a Combination of drawbacks of different systems'।

যাই হোক, আমাদের সংবিধান মূলত ১৯৩৫-এর 'ভারত শাসন অধিনিয়ম'-এর ভিত্তিতে রচিত, সম্ভবত বৃটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদিত সবচেয়ে দীর্ঘ আইন। এই সংবিধানে কিছু বিষয়ে আমাদের কিছু ভিন্নতা থাকলেও সেটিকেই আমাদের প্রধান ভিত্তিভূমি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞ শ্রী দুর্গাদাস বসু বলেছেন 'Three fourths are based on the Government of Indian Act, 1935'।

সংবিধান রচয়িতাদের মনে হয়েছিল বৃটিশ পদ্ধতি অনুসারে সংসদীয় লোকতন্ত্র আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু আইনের শাসন, ন্যায়-এর পর্যালোচনা, দায়িত্বশীল সরকার— সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এই বৃটিশ ধারণাগুলি ভারতবর্ষে চালু করা হয়েছিল। তবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও অন্য দেশ থেকেও বেশ কিছু নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন 'ভারতীয় নীতি নির্দেশক সিদ্ধান্ত' আয়র্ল্যান্ডের সংবিধান ও জেনারেল ফ্রাংকোর আগে স্পেনের সংবিধান থেকে, 'মৌলিক অধিকার'-এর তত্ত্বটি আমেরিকা ও আয়ার্ল্যান্ডের সংবিধান থেকে এবং সংবিধানের প্রস্তাবনাও এসেছে চতুর্থ ফরাসি রিপাবলিক থেকে। অনুরূপভাবে, নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকার ইতালির সংবিধানের প্রথম ভাগ থেকে আর মৌলিক অধিকারের তালিকাও দেখা যাবে জার্মানির ফেডারেল রিপাবলিক (১৯৪৯)-এর সংবিধানে। সংবিধানের ৫১ ধারায় 'Directive Principles of State Policy'-র যে কথা বলা হয়েছে সেই একই রকম নির্দেশ পাওয়া যাবে চতুর্থ ফরাসি রিপাবলিকের সংবিধানের প্রস্তাবনায়, ইতালি রিপাবলিকের সংবিধানের ১১নং ধারায় ও জার্মানির ফেডারেল রিপাবলিকের সংবিধানে।

এইসব তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ভারতীয় সংবিধানের স্বরূপ। ভারতের সংবিধান পরম্পরাগত অর্থে 'ইউনিটারি' (এককেন্দ্রিক) রাখা হলে সংবিধান রচয়িতাদের মনে ভয় ছিল যে তাদের স্বৈরাচারী বলা হতে পারে। আবার ফেডারেল প্রকৃতির সংবিধানের বিপদ সম্পর্কে শ্রী গুরুজীর (এম এস গোলওয়ালকর) সাবধানবাণীও তাদের স্মরণে ছিল। সংবিধান রচয়িতাদের এই দোদুল্যমানতার কারণে তাঁরা আমেরিকার 'ফেডারেল' ব্যবস্থার পরিবর্তে কানাডার পরিকাঠামো গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন কানাডা ফেডারেশন হলেও তার প্রয়োজন হোত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা। গৃহযুদ্ধ কানাডাকে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছিল। সেই কারণে ফেডারেল কাঠামো থাকলেও তাদের বিবেচনায় ছিল একটি শক্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা। ভারতের ইতিহাসেও এই ধরনের কিছু বিষয় আছে দ্বিধাগ্রস্থতার কারণে। ফলে আমাদের অবস্থা 'ইদং চ নাস্তিঃ পরং ন লভ্যতে'-এর অনুরূপ। আমরা উভয়ের ক্ষতিকারক দিকগুলি পেলাম আর হারালাম উভয়ের সুবিধাগুলি।

'একাত্ম মানবদর্শন'-এর রচয়িতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সংবিধান নিয়ে প্রধান আপত্তি ছিল এই যে আমাদের সংবিধানের স্বরূপ ভারতীয় নয়। ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, পরম্পরা, মানসিকতা এবং বর্তমান ও আগামীদিনের প্রত্যাশা পূরণের প্রতিচ্ছবিও নয়। এর অর্থ এই নয় যে সংবিধান রচয়িতাদের ভারতীয় পরম্পরা ও হিন্দু বিধি নিয়ে কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু সংবিধান রচনার সময় ভারতীয় পরম্পরা, সাহিত্য ও জ্ঞানের ব্যবহার করা হয়নি। এই কথা মনে রেখে দীনদয়াল উপাধ্যায় একাত্ম শাসনপ্রণালীর ধারণার সূত্রপাত করেছিলেন।

বর্তমানে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক জটিল আকার ধারণ করেছে। সংবিধানের প্রচলিত পরিধির মধ্যে থেকে তাৎকালিক রাজনৈতিক সমঝোতা চলছে। এই সব সমস্যা এবং আরও নিত্যনতুন সমস্যা সামাধানে তাঁর একাত্ম মানদর্শনের আলোকে আমাদের সংবিধান শুদ্ধ ও ভারতীয় জীবনধারার ভিত্তিতে রচনা করা আজ একান্ত আবশ্যক।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-এর শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত)

দীনদয়ালজীর অবদান

দীনয়ালজীর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে তার সনাতন শাশ্বত সংস্কৃতির এক আধুনিক রূপ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিধাতা অকস্মাৎ তাঁকে আমাদের কাছ থেকে তুলে নিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে গুরুজী স্বয়ং গিয়েছিলেন। অন্তিম দর্শনের জন্য দীনদয়ালজীর মৃতদেহ দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে বিমানের মধ্যে রাখা হয়েছিল। গুরুজী বিমানে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ দেখে নিজেকে শান্ত রাখতে পারেননি। তিনি সেসময় বলেছিলেন— "আমার সবকিছু চলে গেল।" গুরুজীর এই উদ্ধৃতির মধ্যে আমরা এক স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তির আর্তি দেখতে পাই। জনসঙ্ঘ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাজার হাজার কর্মীর দুঃখ এবং দীনদয়ালজীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাঁর মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল তারই প্রকাশ আমরা তাঁর উপরিউক্ত উক্তির মধ্যে দেখতে পাই। শ্রীগুরুজী তাঁর শোকবার্তায় বলেছিলেন— "সঙ্ঘ যে পরম্পরা প্রতিষ্ঠা করেছে, তার ফলে মানবসমাজে বহু রত্ন সৃষ্টি হবে যারা দীনদয়ালজীর ঋক্‌থকে (অবদানকে) সম্মুখে বহন করে নিয়ে যাবে।"

দীনদয়ালজীর এই ঋক্‌থ কী? আর তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বলতেই বা কী বুঝানো হয়েছে? রাজনীতিতে ক্ষমতার উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য কত ছলনা, কত ষড়যন্ত্র, কত কৌশল তৈরি করা হয়। কিন্তু দীনদয়ালজীর উত্তরাধিকার অর্থাৎ ঋক্‌থ হলো বিশুদ্ধ আচরণ এবং তাঁর অভিপ্রেত নতুন রাজনৈতিক চিত্র পরিবর্তনের জন্য এবং ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যার সমাধান করার জন্য দীনদয়ালজী যেসব তত্ত্ব ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে কী এবং তার উপযোগিতা কতখানি তা আমাদের বুঝতে হবে। ভারতবর্ষের অনির্ণীত সমস্যা কী? সেগুলি সমাধানের জন্য দীনদয়ালজীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং ব্যক্তিত্ব কতটা উপযোগী হবে? তা দ্বিতীয় প্রশ্ন। কিন্তু তৃতীয় প্রশ্ন হলো, এই ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ কতখানি? দীনদয়ালজীর কৃতিশীল পরম্পরাকে সম্মুখে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তবে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর আগে খুঁজতে হবে।

জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি

ভারতীয় জাতি কোনো নতুন জাতি নয়। এক প্রাচীন সংস্কৃতির উপর দণ্ডায়মান ভারতবর্ষ সেই প্রাচীন ভারতবর্ষেরই নতুন অভিব্যক্তিমাত্র। যে সঙ্ঘ পরিবার থেকে দীনদয়ালজী রাজনীতিতে এসেছেন; এটি ছিল তাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত।

আজ এই দেশে সামাজিক নৈতিকতা নেই। রাজনৈতিক নৈতিকতার তো নামগন্ধ নেই; আর সাংবিধানিক নৈতিকতাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি কেবল শাসন ক্ষমতা লাভের নীতিতে পরিণত হয়েছে। অধর্মই আজকে ধর্ম হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অভিশাপস্বরূপ হবে। দীনদয়ালজী এই প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন— "লঙ্কায় সোনার ইট ছিল, কিন্তু রামরাজ্য ছিল না।" রাজনীতির উপর ধর্ম তথা উত্তমনীতির নিয়ন্ত্রণই ভারতবর্ষের প্রাচীন পরম্পরা। ধর্ম কথার অর্থ কোনো বিশিষ্ট মতবাদ বা সম্প্রদায় নয়, বরং সমাজকে যা ধরে রাখে তাকেই বলে ধর্ম। এটিই হিন্দু পরম্পরাগত ধর্ম কথার অর্থ। ভারতবর্ষে এইরকম নৈতিক রাজ্য নির্মাণ করা ব্যতীত এখানে সুখ এবং সন্তোষ পাওয়া যাবে।

ক্ষমতা নিরপেক্ষ নেতৃত্বের আবশ্যকতা

ভারতবর্ষের সমস্যা কেবল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক সমস্যা নয়; বরং এই সমস্ত সমস্যার সমাধান সৃষ্টিকারী জীবনমূল্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার সমস্যা। অতএব এই মূল্যবোধ এবং মূল্য নির্ণয় আজকের মুখ্য প্রশ্ন। এই মূল্যবোধ সমাজের রক্তচাপ স্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কাজ করার জন্য ক্ষমতা নিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্মাণ করতে হবে। দীনদয়াল এইরকম ক্ষমতা নিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের আদর্শ ছিলেন। দীনদয়ালজী যে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রবক্তা ছিলেন তার মূল কথা হলো— গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জনসাধারণই দেবতাস্বরূপ। এইভাবে তিনি রাজনীতিকে লোক- নীতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

গণতন্ত্রের ব্যবহার এবং আদর্শ কেমন হবে, সেই বিষয়ে দীনদয়ালজীর চিন্তাধারা এমনই মৌলিক যে, ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রতিভাত হবে।

ভারতীয় রাজনীতি যদি তার মূলশিকড় লোকনীতির মধ্যে প্রবিষ্ট করতে চায়, তবে তাকে সর্বাগ্রে জাতীয়তাবাদী হতে হবে। জাতীয়তাবাদই রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ১৯৬২ সালে যথাক্রমে ভারত-চীন ও ভারত-পাক যুদ্ধের সময় জনসঙ্ঘ ভারত সরকারকে যে সহযোগিতা দিয়েছিল তা দলগত রাজনীতির উপরে অধিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্তম উদাহরণ। তাই মনে হয়, দীনদয়ালজীর রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল জাতি-সমাজ-দেশ। তাঁর সমস্ত চিন্তাধারা জাতীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বিচার দর্শন (৩য় খণ্ড) থেকে সংকলিত)

পাহাড় কাটা মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাহাড় ভাঙা অর্থাৎ পাহাড় ডিঙ্গানো নয়, একেবারে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করা। ২৫ ফুট চওড়া, ১০০ ফুটের বেশি লম্বা। যন্ত্রের দ্বারা নয়, শুধু ছেনি, হাতুড়ি ও শাবল দিয়ে। আজ তিনি পাহাড় মানুষ নামে পরিচিত। তাঁকে নিয়ে চলচ্চিত্রও নির্মাণ হয়েছে।

বিহারের রাজধানী পাটনা শহরের প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে গেহ্লৌর গ্রাম। একেবারে পাহাড়ের নীচে। গরিব, দিনমজুর লোকেরাই বাস করেন এই গ্রামে। দশরথ মাঁঝি এই গ্রামের একজন দিনমজুর। পাহাড়ের ওপারে যাওয়ার জন্য খুবই সঙ্কীর্ণ চড়াই-উৎরাই একটি গলিপথ আছে। দশরথ মাঁঝি প্রতিদিন সেই পথে ওপারে গিয়ে অন্যের জমিতে কাজ করেন। দুপুরে কষ্টসাধ্য পথে বাড়িতে খেতে আসার সময় থাকে না। তাই তাঁর স্ত্রী ওই পথেই প্রতিদিন তাঁর জন্য খাবার নিয়ে যান। এভাবেই তাঁদের সংসার চলছিল।

১৯৬০ সালে একদিন দুপুরে ওই সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী নীচে খাদে আছড়ে পড়ে। চিৎকার শুনে তিনি কাছে এসে দেখেন মাথায় আঘাত লেগে স্ত্রী অচৈতন্য। কাছাকাছি কোনো ডাক্তারখানা নেই। ওপারের শহর ওয়াজিরগঞ্জ। ঘুরে যেতে হলে ৭০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। ভাবতে ভাবতে স্ত্রী মারা যান।

স্ত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে তিনি কাঁদতে বসলেন না। মনে কঠোর সঙ্কল্প করলেন পাহাড়টাকে কেটে ওপারে ওয়াজিরগঞ্জ যাওয়ার একটা রাস্তা বের করতেই হবে। আর রাস্তা যদি হয়ে যায় তাহলে এক্কাগাড়িতে ওয়াজিরগঞ্জ যেতে মাত্র মিনিট পনেরোর পথ। ওখানে ভালো ভালো ডাক্তার আছে। আর কেউ বিনা চিকিৎসায় বেঘোরে প্রাণ হারাবে না।

সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে কাজও শুরু করে দিলেন দশরথ মাঁঝি। ছেনি, হাতুড়ি ও শাবল নিয়ে লেগে পড়লেন পাহাড় কাটতে। গ্রামের লোকেরা বলতে শুরু করলো— 'এ তো পাগলের পাগলামি। বউ মরার পর লোকটা সত্যিই পাগল হয়ে গেল।' গ্রামের লোক ঠাট্টা করেছে, কেউ কেউ তাঁকে বিরত করতে চেষ্টা করেছে, কেউ কেউ ধমকও দিয়েছে পাগলামি বন্ধ করতে। কিন্তু দশরথ তাতে থামেননি, বরং তাঁর রোখ আরও বেড়েছে।

প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা করে একটু একটু করে পাহাড় কেটেছেন। দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর পরিশ্রমের ফলে অসম্ভব একদিন সম্ভব হলো। পাহাড় কেটে ১০০ ফুট লম্বা রাস্তা তিনি বানিয়ে ফেলেছেন— ওয়াজিরগঞ্জ এখন হাতের কাছেই। দৌড়ে গেলে আধঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তারখানা ও বাজারে পৌঁছনো যাবে। সেদিন আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন দশরথ মাঁঝি। পাহাড়ে সুরঙ্গ কাটেননি তিনি, ৩৬০ ফুট অর্থাৎ ত্রিশ তল উঁচু বাড়ির সমান পাহাড় কেটে ফেলেছেন। যারা সেদিন তাঁকে পাগল ভেবেছিল, আজ তারা বিস্ময়ে হতবাক। তা সত্ত্বেও তাঁর এই অসাধ্যসাধনের কথা গেহ্লৌর গ্রাম আর ওয়াজিরগঞ্জের মানুষ ছাড়া কেউ জানতোই না।

এক সময় তাঁর ইচ্ছা হলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর কাজের কথাটা জানাবেন। ২০০৭ সালে পাটনায় যান মুখ্যমন্ত্রী নীতিশকুমারের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর মুখে পাহাড় কেটে ১০০ ফুট লম্বা ও ২৫ ফুট রাস্তা তৈরি করার কথা শুনে নীতিশকুমার তাঁর চেয়ার ছেড়ে ওঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ নিয়ে যখন জানলেন দশরথ মাঁঝি সত্যিকথা বলছেন তখন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে একবার বসার অনুরোধ করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ তিনি রক্ষা করেছিলেন মাত্র ১ মিনিটের জন্য। সেদিন তিনি তাঁর গ্রামের জন্য বেশ কয়েকটা দাবি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। সব দাবি সানন্দে মঞ্জুর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুদানে গেহ্লৌর গ্রামে একটা স্কুল, একটা হাসপাতাল হয়েছে। গেহ্লৌর থেকে ওয়াজিরগঞ্জ যাওয়ার রাস্তা পাকা হয়েছে। গ্রামের নাম বদলে এখন হয়েছে দশরথনগর। সরকার থেকে দশরথ পেয়েছেন ১৫ বিঘা জমি। তাঁর পুত্র ভগীরথ বলেন, ‘‘বাবার জন্যই তো গ্রামটা বদলে গিয়েছে। গ্রামের সবাই বাবার জন্য গর্ববোধ করে।’’

অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য তাঁর নাম আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। চিত্র নির্মাতা কেতন মেহ্তা তাঁকে নিয়ে হিন্দী ও ইংরেজি ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন— 'মাঁঝি, দ্য মাউনটেইন ম্যান'। দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করছেন অভিনেতা নোয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি। ■

ARE YOU SEARCHING
FOR A PROPERTY PLANNER ?

PROPERTY
BUY SALE RENT

Contact
DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945
RANAJIT MAZUMDAR 9339861465

S M WEALTH INFRAREALTOR LLP | 52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

স্পণ্ডিলাইটিস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, এম ডি (হোমিও)

স্পন্ডিলাইটিস কী?

মানবদেহের মূলস্তম্ভ মেরুদণ্ড। করোটির নীচে থেকে কোমর পর্যন্ত হাড়টিই হল মেরুদণ্ড। যার দু'পাশে গাছের শাখার মতো যে হাড়গুলো রয়েছে সেগুলি হল ভার্টিব্রা। ৩৩টি ভার্টিব্রা আছে মেরুদণ্ডে। দু'টি ভার্টিব্রার মাঝখানে থাকে থকথকে জেলির মতো অংশ যার নাম ডিস্ক। কোনো কারণে ভার্টিব্রা মেরুদণ্ডের সন্ধিতে কোনোরকম অসঙ্গতি সৃষ্টি হলে ঘাড়ে পিঠে, কোমরে বা কখনো হাতে, পায়ে ও মাথায় যন্ত্রণা হয়। এই যন্ত্রণা সৃষ্টিকারী রোগটিই 'স্পন্ডিলাইটিস'।

কী কারণে হয়?

মেরুদণ্ডের ক্ষয়জনিত রোগ 'স্পন্ডিলাইটিস'। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকেরই মেরুদণ্ড ব্যবহারজনিত ক্ষয় হয়। ফলে দুই ভার্টিব্রার মধ্যস্থিত ডিস্ক স্থানচ্যুত হয়ে যেতে পারে। এছাড়া আঘাতজনিত কারণেও ভার্টিব্রা ফুলে গিয়ে ডিস্ক-এর স্থান সঙ্কুচিত করে দিতে পারে অথবা একটির ওপর একটি উঠে যেতে পারে। ভার্টিব্রার পাশ দিয়ে যে সমস্ত স্নায়ু বেরিয়েছে সেগুলিতে যত চাপ পড়বে ততই যন্ত্রণা বাড়বে। মেরুদণ্ডের ভার্টিব্রাগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) সারভাইক্যাল ভার্টিব্রা (২) থোরাসিক ভার্টিব্রা (৩) লাম্বার ভার্টিব্রা (৪) সেক্রাম ভার্টিব্রা (৫) টক্সিল ভার্টিব্রা।

এই ৫টি ভার্টিব্রার মধ্যে স্পন্ডিলাইটিসের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা হলো সারভাইক্যাল ভার্টিব্রা, থোরাসিক ভার্টিব্রা ও লাম্বার ভার্টিব্রা। বেশি ঘাড় ঝুঁকিয়ে লেখাপড়া করলে বা বারবার কোমর ঘুরিয়ে কোনো কাজ করলে সারভাইক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রার সংযোগস্থলে এবং থোরাসিক ও লাম্বার ভার্টিব্রার সংযোগস্থলে চাপ পড়ে। এ থেকেই ঘাড়ে বা কোমরে যন্ত্রণা হয়। হঠাৎ জোরে ঝাঁকুনি খেলেও ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্কটি সাময়িকভাবে স্থানচ্যুত হয়ে ব্যথার সৃষ্টি করে। এটাও স্পন্ডিলাইটিস।

উপসর্গ

এই রোগে হাত পায়ের আঙুল ঝিনঝিন করে। পায়ের পেশীতে খিচ ধরতে পারে। ঘাড় বা কোমর শক্ত হয়ে জড়তা সৃষ্টি করতে পারে। হাঁচি, কাশিতে ঘাড়ে ও কোমরে ব্যথা অনুভব হবে। সহজভাবে হাঁটা যাবে না ইত্যাদি।

কাদের বেশি হয়?

যারা নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করেন তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগেরই এই অসুখ দেখা যায়। পুরুষরা সাধারণত ৪৭ বছরের মধ্যে এবং মহিলারা ৩৮-৬৪ বছরের মধ্যে আক্রান্ত হন।

চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথি আরোগ্য নীতি অনুসারে রোগীর ডিজিজ সিম্পটমস্ ও কনস্টিটিউশনাল সিম্পটমস্ মিলিয়েই ওষুধ নির্বাচন করতে হয়। তবে নিম্নলিখিত ওষুধগুলো সফলভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে (১) কাস্টিকাম (২) রাসটক্স (৩) ব্রায়োনিয়া (৪) হেক্লালাভা (৫) রুটা (৬) স্যানগুনেরিয়া (৭) ল্যাকন্যানথেস্।

করণীয়

(১) খুব শক্ত বা খুব নরম বিছানায় শোবেন না।
(২) ঘাড় নীচু করে লেখাপড়া করবেন না।
(৩) কোনো ভারী জিনিস তুলতে হলে হাঁটু মুড়ে তুলবেন।
(৪) ঘর পরিষ্কারের সময় লম্বা হাতওয়ালা ঝাড়ু ব্যবহার করবেন।
(৫) যদি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তবে একটি পা একটু উঁচু রেখে দাঁড়াবেন।
(৬) ধূমপান করবেন না।
(৭) চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ব্যথা কমার ওষুধ খাবেন না।

বাচামারী শিশুমন্দিরে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

সমাবেশ সমাচার

গত ৫ সেপ্টেম্বর মালদা জেলার বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে (বাচামারী গভঃ কলোনী) শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন শিশুমন্দিরের পাঠরত ৫ম শ্রেণীর ১১ জন শিক্ষার্থী আচার্য/আচার্যা বেশে প্রভাত শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর কালাংশ নেয়। সেদিনের কালাংশ শিশু মন্দিরের পরিবেশে এক অভিনবত্বের ছাপ ফেলেছিল। একটি কালাংশের পরে এলাকার শিক্ষকদের এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে ১৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং তাঁদের চন্দনের টিপ দিয়ে বরণ করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান আচার্য বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিদ্যাভারতীর শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান শেষে সম্পাদক মহাশয় শিক্ষকমণ্ডলীর হাতে একটি করে স্বামী বিবেকানন্দের 'অভীঃ' বই উপহারস্বরূপ তুলে দেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রবন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। বিকেল ৪টায় শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় অরুণ ও উদয় শ্রেণীর ৮২ জন ভাই-বোন অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার পর তাদের নিয়ে নগর কীর্তন-সহ পথপরিক্রমা হয় এবং শিশুমন্দিরের আচার্যাবৃন্দ তাদের স্বহস্তে তৈরি করা পায়েস, তালের বড়া, লুচি, ক্ষীরের নাড়ু পরিবেশন করেন।

শিশুমন্দিরের সম্পাদক অধ্যাপক বিজয় ঘোষ সেদিনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে উপহারস্বরূপ একটি করে গীতা তুলে দেন শিশুমন্দিরের সম্পাদক এবং প্রধান আচার্য।

দুর্গাপুরে সেবা বিভাগের রাখি উৎসব

দুর্গাপুর সেবা বিভাগের পরিচালনায় গত ২৯ আগস্ট দুর্গাপুর নগরের বিভিন্ন বস্তিতে এবং নগর সংলগ্ন গ্রামে রাখি উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রী, পরিচালন সমিতির কার্যকর্তা এবং সেবা কেন্দ্রের দিদিভাই-দাদাভাইরা অংশগ্রহণ করেন। সেবা কেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে জনসম্পর্ক অভিযান করা হয় এবং বিপুল উৎসাহে বহু ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। অণ্ডাল বিমানবন্দর সংলগ্ন আমলৌকা গ্রামে গ্রাম-পঞ্চায়েত সদস্য সেবা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জনসম্পর্ক করেন। দুর্গাপুর নগরের নীলডাঙ্গা বস্তিতে বেশ উৎসাহের সঙ্গে রাখি উৎসব পালিত হয়। প্রায় ৫০০০ জনসম্পর্ক সেবা বিভাগের প্রচেষ্টায় করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাখি উপলক্ষ্যে মাতৃসম্মেলন ইছাপুর পঞ্চায়েত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

বড়জোড়ায় জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

বাঁকুড়ার বড়জোড়া প্রখণ্ডের ৬টি খণ্ডে ১০ স্থানে জন্মাষ্টমী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছে। সেখানে কৃষ্ণ সাজো, কৃষ্ণের ছবিতে রং ভরো ও মহাভারতের প্রশ্ন-উত্তর ক্যুইজ আকারে প্রতিযোগিতার আসর বসে। কৃষ্ণনগর, খুটগোড়িয়া, গোকুল-মথুরা, মালিয়াড়া, ভিড়কারশোল ও বড়জোড়ায় মোট ৪০ জন কার্যকর্তা এবং ১০০০ জন শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত ছিলেন। বড়জোড়ার এক অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কার্যকর্তা বলরাম সাঁতরা ও বড়জোড়া প্রখণ্ডের সম্পাদক, সভাপতি উপস্থিত ছিলেন।

চাঁচোল শিশুমন্দিরে জন্মাষ্টমী ও শিক্ষক দিবস

শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ৫ সেপ্টেম্বর চাঁচল বিবেকানন্দ শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় একশো ছোট ছোট শিশু রাধা ও কৃষ্ণ সেজে এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাদের বিভিন্ন ভাবভঙ্গি মুগ্ধ করে সকলকে। এছাড়াও শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটিকেও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের 'ছাত্রশক্তি মহামিছিল'

গত ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরি বরিকর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক সুবীর হালদার এবং রাজ্য সংগঠন সম্পাদক কিশোর বর্মণ জানান, শিক্ষাঙ্গনে মারামারি, ছাত্রহত্যা, শিক্ষক-অধ্যাপকদের অপমান ও লাঞ্ছনা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাসের পরিবেশ নির্মাণের বিরুদ্ধে আগামী ৭ অক্টোবর এবিভিপি-র উদ্যোগে এক মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। ওইদিন রাজ্যের সমস্ত কলেজ ও ইউনিভারসিটি থেকে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবেন। উপস্থিত থাকবেন সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক সুনীল আম্বেকর। মহামিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে রওনা হয়ে ধর্মতলা পৌঁছবে।

মহামিছিলে যে দাবিগুলি উত্থাপন করা হবে :

- কলেজ-ইউনিভারসিটিতে দলীয় রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও অধ্যাপক নিগ্রহ বন্ধ করতে হবে।
- ভর্তির নামে তোলাবাজি বন্ধ করে সর্বত্র অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।
- লিংডো কমিশনের সুপারিশ মেনে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও অনলাইন নমিনেশন প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।
- এস এস সি, টেট পরীক্ষায় নৈরাজ্য বন্ধ করে সমস্ত শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
- কলেজ-ইউনিভারসিটিতে ছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

চাঁচলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শোভাযাত্রা

নন্দোৎসব উপলক্ষে ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। চাঁচল ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রায় ৮০০ জন ভক্ত খোল করতাল সহযোগে নামসংকীর্তন করে চাঁচল শহর পরিক্রমা করে।

বালুরঘাটে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের স্মারকপত্র প্রদান

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের দক্ষিণ দিনাজপুর পুর জেলা সমিতির পক্ষ থেকে গত ১০ সেপ্টেম্বর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। জাতীয়তাবাদী, দেশাত্মবোধক পাঠক্রম যা ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা ভিত্তিতে নির্ধারিত এবং মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে এমন শিক্ষানীতি রাজ্যে চালু করার কথা উল্লেখ করা হয়। ১৮টি দাবি সম্বলিত একটি দাবিপত্রও পেশ করা হয়।

মালদা সংস্কার ভারতীর শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উদযাপন

মালদহ শহরের নেতাজী সুভাষ রোডের সরস্বতী শিশুমন্দিরের সভাগৃহে ৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পালিত হয় মালদহ সংস্কার ভারতীর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব। এদিন দীপমন্ত্র উচ্চারণ করে দীপ প্রজ্বলন করেন সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ-সভাপতি সঞ্জয় নন্দী। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর মালদার সভাপতি গজেন দাস, প্রবীণ প্রচারক চন্দন সেনগুপ্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাউল শিল্পী তপন পণ্ডিত। উৎসবের শুরুতে সকলে সংস্কার ভারতীর ভাবসঙ্গীত 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী' গাওয়ার পরে আরও দুটি কৃষ্ণের গান সমবেত ভাবে পরিবেশিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঞ্চারী বসাক, সঙ্গীতা দে, শুক্লা রায়, সুমিতা ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী সরকার, তন্দ্রা পাল ও গজেন দাস। তবে সকলের মন কেড়ে নেয় দূরদর্শন বিখ্যাত বাউল শিল্পী তপন পণ্ডিত। সঙ্গতে ছিলেন জয় রায়চৌধুরী ও সঞ্জয় নন্দী।

দিনহাটা সারদা শিশুতীর্থে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

ড. সর্বপল্লী রাধকৃষ্ণানের জন্মজয়ন্তীতে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষক দিবস উৎযাপিত হয় দিনহাটা মদনমোহন পাড়া সারদা শিশুতীর্থে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই দিনটিতে সমাজের আদর্শ শিক্ষক চয়ন করে 'সারদা শিক্ষা সম্মাননা' প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দিনহাটা মহকুমা সঙ্ঘচালক অখিল চন্দ্র সরকার। তিনি তাঁর বক্তব্যে সকল আচার্য-আচার্যা ও শিক্ষার্থী ভাই-বোনকে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের আদর্শ অনুসরণ করে মানুষ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ— এ কথা মাথায় রেখে শিক্ষক দিবসে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শিক্ষার্থী ভাই-বোনেরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাসে আচার্য-আচার্যার ভূমিকা পালন করে। তাদের হাতেই শিক্ষক দিবসে ক্লাস নেওয়ার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। এদিন কেউ বাংলা, কেউ অঙ্ক, আবার কেউ বা ইংরাজি ক্লাস নেয়। তারা ক্লাসে চক-ডাস্টার হাতে নিয়ে পড়া বোঝানোর ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে উত্তর জানার চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ের আচার্য-আচার্যারা শ্রেণীতে বসে খুদে আচার্য-আচার্যদের পাঠদান চাক্ষুষ করেন। তাঁরা সকলে খুদে আচার্য-আচার্যাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

অর্শ চিকিৎসা শিবির

গত ১১ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া জেলার কবিরচক গ্রামে সেবা ভারতীর উদ্যোগে অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয় গোকুলচন্দ্র সারদা শিশুমন্দিরে। অর্শ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি সি সাহা ৫০ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সেবাপ্রমুখ শিশির গঙ্গোপাধ্যায়।

মঙ্গলনিধি

গত ১১ আগস্ট হিন্দুজাগরণ মঞ্চের বারুইপুর জেলা সম্পর্ক প্রমুখ সূর্যেন্দু পাল ও শ্রেয়া পালের শুভবিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে সূর্যেন্দুর পিতা অতনু পাল এবং মাতা কৃষ্ণা পাল সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি শিবদাস বিশ্বাসের হাতে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালী মঙ্গলনিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের সহপ্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, সহপ্রান্ত সেবাপ্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ, বিভাগ প্রচারক বিজয় পাতর, জেলা কার্যবাহ স্বপন সাহা, জেলা প্রচারক অমিত সরকার, হিন্দুজাগরণ মঞ্চের প্রান্ত সম্পাদক স্বরূপ দত্ত, বিজেপি-র প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক দিলীপ ঘোষ-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

***

গত ১০ আগস্ট, ২০১৫, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমা কার্যবাহ জয়ন্তশীল তাঁর একমাত্র মেয়ের বিবাহে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেবাপ্রমুখ শিশির গঙ্গোপাধ্যায় এবং বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

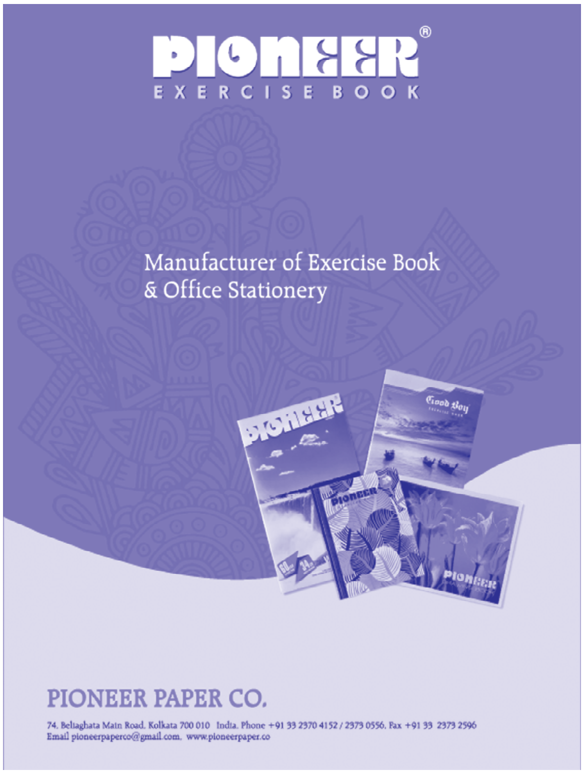

শ্রীলঙ্কায় সিরিজ জয় আত্মবিশ্বাস জোগাবে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তাদের মাটিতে ২২ বছর পর টেস্ট সিরিজ জিতে ফেরাটা অবশ্যই কৃতিত্বের। কিন্তু ভুললে চলবে না একসময়ের উপমহাদেশের এক নম্বর টিম শ্রীলঙ্কা এখন একটা পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ভাঙাগড়ার এই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীলঙ্কা শুধু ভারত নয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও সিরিজ হেরেছে অব্যবহিত পূর্বে। পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণকেই সামলাতে হিমসিম খেয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা ব্যাটিং। ভারতের অন্তত দু-তিনজন টেস্টম্যানের বোলার আছে যারা বেশ খানিকটা অভিজ্ঞ বটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। পাক দলে সেরকম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বোলারই বা কোথায়! একমাত্র ইয়াসির মাহ টেস্টম্যানের লেগ স্পিনার। বাকিদের সেই পর্যায়ে আসতে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

কুমার সাঙ্গাকারা আর অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ এই দুই ব্যাটসম্যান নির্ভরতাই কাল হয়েছে শ্রীলঙ্কার। সঙ্গে ১৫ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে বাজে ফর্মে ছিলেন পাকিস্তান ও ভারতের বিরুদ্ধে। ক'মাস আগে বিশ্বকাপে যার ব্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছে চার-চারটে শতরান, তিনি এরকমভাবে টেস্ট জীবনে ইতি টানবেন, তা বোধহয় নিয়তি নির্দিষ্ট 'পোয়েটিক জাস্টিস।' সবেধন নীলমণি অ্যাঞ্জেলোই এখন শ্রীলঙ্কা ব্যাটিংয়ের হৃদপিণ্ড, মেরুদণ্ড। দীনেশ চান্দিমল প্রতিভাবান কিন্তু এখনও দলকে নির্ভরতা দেওয়ার মতো জায়গায় আসেননি। গোটা সিরিজে কালেভদ্রে কখনও বড় ইনিংস খেলেন। জয়বর্ধনে, সাঙ্গাকারা, দিলসানের অবসরের পর যে বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়েছে শ্রীলঙ্কা ব্যাটিংয়ে, তা সহজে ভরাট হবার নয়।

ব্যাটিংয়ের মতোই বোলিংয়ের অবস্থা তথৈবচ তাদের। পেসার দামিকা প্রসাদ নতুন বলে প্রথম স্পেলে যতটা কার্যকরী, পরের দিকে সেভাবে ধাক্কা দিতে পারেন না। স্পিনার রঙ্গনা হেরাথ টার্নিং, বাউন্সি স্ট্রিপ পেলে উইকেট পান। না হলে তাকে অতি সাধারণ দেখায়। ব্যাস, মুরলীধরণ, মালিঙ্গার অভাব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে শ্রীলঙ্কা। আর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সব বিভাগে পর্যুদস্ত হবার পর কোচ মার্ভান আতাপাত্তু দায়িত্বও ছেড়ে দিয়েছেন। চরম সংকটে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট। অন্যদিকে ভারতের তরুণ দলটি কিন্তু এই সিরিজ জয় থেকে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাসটুকু পেয়ে গেছে। অধিনায়ক কোহলির আগ্রাসী নেতৃত্ব ও দাপুটে ব্যাটিং টিমের 'বডিল্যাঙ্গুয়েজ' পালটে দিয়েছে। দু-চারজন বাদে বেশিরভাগ ক্রিকেটারের অভিজ্ঞতা সেভাবে গর্জে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও দরকারের সময় নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে দিয়েছে। প্রথম টেস্টের শেষ ইনিংসে হেবারের সাদামাটা স্পিনের হদিস না পেয়ে উইকেট দিয়ে এসেছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। না হলে ওই একটা সেসন বাদে তিন টেস্টের সিরিজে কর্তৃত্বের রাস ছিল ভারতীয়দের হাতেই।

বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগে সব ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারে ভারত। তারপরে বাংলাদেশ সফরে গিয়ে টেস্ট ও একদিনের সিরিজে প্রত্যাশিত দুরন্ত ফর্মে ছিল না ভারত। তাই চিন্তা ছিল শ্রীলঙ্কা সফর নিয়ে। যতই দুর্বল ও ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে খেলা হোক, বিদেশে ভারতের 'ট্রাক রেকর্ড' মোটেই কহতব্য নয়। ২০১১-তে শেষ বিদেশে সিরিজ জিতেছে ভারত। তাও অনভিজ্ঞ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। তারপর থেকে শুধুই ব্যর্থতা আর হতাশার চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়া। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড সর্বত্র—সবুজ বাউন্সি পিচে ব্যাটিং, বোলিং দু-দিকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি ভারতকে। তাই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে জয় যেন দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে বের করে এনে নতুন অক্সিজেন জোগাবে ভারতীয় ক্রিকেটকে।

বছরের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা আসছে ভারত সফরে। চার টেস্টের সিরিজ নবগঠিত ভারতীয় দলের কাছে সেটা অগ্নিপরীক্ষা। দক্ষিণ আফ্রিকাও অভিজ্ঞতার সঙ্গে নবীন প্রতিভার সমন্বয়ে দলটাকে নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা করছে। দু-দলেরই শক্তি ও দুর্বলতার মধ্যে বিশেষ ফারাক নেই। তাই ফেবারিট হিসেবেই শুরু করবে ভারত। ■

শব্দরূপ-৭৬৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১	■	■	২		৩		■
	■	■		■		■	■
৪	৫			■		■	■
■		■	■	৬		৭	■
■	৮	৯		■	■		■
■	■		■	১০			১১
■	■		■		■	■	
■	১২				■	■	

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. ধর্মশাস্ত্রকার যজুর্বেদ-প্রয়োজক ঋষিবিশেষ, ৪. প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ, ৬. প্রাচীর, ৮. বস্ত্র, **১০.** জগদীশ্বর; কাশীর শিব, **১২.** যে ভারস্বরূপ হইয়া পরের উপর নির্ভর করে; বোঝা।

উপর-নীচ : **১.** জানালা, **২.** যজ্ঞসম্পাদক; পুরোহিত, **৩.** বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম, **৫.** যে পুস্তকে তারিখ তিথি পর্বদিন শুভদিন ইত্যাদি থাকে, **৭.** 'ওরা কোনো 'ল' মানে না, তাই ওদের নাম '—', **৯.** ফড়িং জাতীয় পতঙ্গবিশেষ যারা সদলে শস্যাদি নিঃশেষ করে, **১০.** প্রিয়জন হতে বিচ্ছেদ, **১১.** গজেন্দ্রগমন।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৬০
সঠিক উত্তরদাতা
সাগর রায়
নিশিগঞ্জ, কোচবিহার
নবেন্দু ঘোষ
ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ

জ	র	দ্গ	ব	■	অ	লি	■
■	জ	■	ৎ	■	জ	■	সা
মা	ন	তা	সা	■	গ	■	ত
ন	■	■	দ	বি	র	খা	স
ম	য়	দা	ন	ব	■	■	কা
ন্দি	■	য়	■	দ	ন্তা	ব	ল
র	■	ভা	■	মা	■	স	■
■	ঘো	গ	■	ন	রা	ন্ত	ক

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭৬৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ নভেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ৪

রাজপুত্ররা দেরি করছে দেখে সমুদ্রগুপ্ত তাদের খোঁজে রক্ষী পাঠালেন।

রক্ষীরা এসে সমুদ্রগুপ্তকে খবর দিল।

সেই সময় রাজপুত্ররা এবং তাদের বন্ধুরা এল। সঙ্গে এল জনতা জয়ধ্বনি দিতে দিতে।

ক্রমশঃ

ঐতিহ্য ও সমসাময়িকতার মেলবন্ধন

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা : ১৪২২

পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত — নৈরাজ্য (রহস্য উপন্যাস)

সুমিত্রা ঘোষ — তোরা কোন গগনের তারা? (সামাজিক উপন্যাস)

প্রবন্ধ

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. প্রসিত রায়চৌধুরী, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়, নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য, অমলেশ মিশ্র, দেবব্রত ঘোষ, রমেশ পতঙ্গে, নবকুমার ভট্টাচার্য, বরুণ দাস, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত রায়।

বড় গল্প

গোপালকৃষ্ণ রায়

গল্প

রমানাথ রায়, শেখর বসু, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, এষা দে, গোপাল চক্রবর্তী, গার্গী দেব, সিদ্ধার্থ সিংহ।

বিচিত্র রচনা

পিনাকপাণি ঘোষ — চিঠি মিঠি, অর্ণব নাগ — সেকালের মেসবাড়ি, তাপস অধিকারী — পশুপাখির মাতৃস্নেহ।

চরিতকথা

জহর মুখোপাধ্যায় — কলকাতায় প্রথম নিবেদিতা

পুরাণকথা

বিজয় আঢ্য — এক রূপান্তরিত পুরুষের কথা

ভ্রমণ

সুভাষ বিশ্বাস— রথ উৎসবে হাম্পি

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়— বিষ্ণুপুরের দশাবতরী তাস

মূল্য : ৭০ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।। মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
21 September - 2015 - Rs. 10.00